বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমীপে পত্র রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

ক্রমিক নং : কো-অর্ডি-৭১ / ১৫
তারিখ : ২৩.১১.২০১৫

বিষয় ঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন সম্পর্কে

মহাশয়া,

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন তাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীর নিকট পেশ করেছেন। বর্তমানে সকল রাজ্য সরকার সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেহেতু রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ও ভাতা সমূহের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত বেতন কাঠামো ও ভাতাকে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে (pattern) কয়েক দশক ধরে অনুসরণ করে চলেছেন, উপরোক্ত সুপারিশ সমূহকে ঘিরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অস্থিরতা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

আপনার স্মরণে থাকতে পারে যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন গঠন, কমিশনের শর্তাবলী প্রণয়ন ও কমিশনের সদস্যদের নাম ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মহার্ঘভাতা ১০০ শতাংশ পাওনা হওয়ায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ এক পত্র মারফৎ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের ব্যাপারে আপনাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

পরবর্তীকালে গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন সহ ৫ দফা দাবিতে কলকাতায় ও উত্তর বাংলার শিলিগুড়িতে আয়োজিত কর্মচারীদের দুই বিশাল সমাবেশ থেকে আমরা একটি স্মারকলিপি আপনার সমীপে প্রেরণ করি এবং সাক্ষাতের দাবি জানাই। তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি আলোচনার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে দায়িত্বদ্ধ করেন। ঐ দিনই (১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪) আমরা স্মারকলিপিতে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের জন্য সুস্পষ্ট দাবি জানাই।

এরপর কেন্দ্রীয় বাজেটে রাজ্যগুলি থেকে সংগৃহীত করের অংশ ৩২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪২ শতাংশ রাজ্যগুলিতে বণ্টনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত করার প্রাক্কালে গত ১১ মার্চ, ২০১৫ আমরা পুনরায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য তৎকালীন সময়ে বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা সহ ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

অত্যন্ত ক্ষোভ ও যন্ত্রণার কথা হল এই যে আপনার জনসমক্ষে প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের কোনো সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার ঘোষণা করেনি। অন্যদিকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ রূপায়িত হয়নি।

এক্ষেত্রে আমাদের দাবি অনতিবিলম্বে পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ কার্যকরী করা সহ বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান করে অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করা হোক।

ধন্যবাদান্তে
ভবদীয়
(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

ক্ষোভ-বিক্ষোভ-আন্দোলনের চাপে

অবশেষে গঠিত হল ষষ্ঠ বেতন কমিশন

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন ইতোমধ্যে তাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। গত ১৯ নভেম্বর ২০১৫, কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ কে মাথুর সুপারিশগুলির সঙ্কলন (মোট ৭০০ পৃষ্ঠার) তুলে দেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির হাতে। এখন সরকার এই সুপারিশগুলিকে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বেতন কমিশনের সুপারিশ সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকরী হবে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে, অতীতের রীতি মেনে বর্তমান বি জে পি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের উচিত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলির সাথে আলোচনায় বসা। কারণ বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে কর্মচারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিফলন বেতন কমিশনের সুপারিশে ঘটে না। বরং কখনও কখনও কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী কিছু প্রসঙ্গও বেতন কমিশনের সুপারিশে থাকে। এবারেই যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সংগঠনগুলির অভিমত হল, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে যথোপযুক্ত বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ কমিশন করেনি। অসংশোধিত বেতনক্রমের সাথে সুপারিশকৃত সংশোধিত বেতনক্রমের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় গড় বৃদ্ধি ২৩.৫ শতাংশ। আর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত ১১৯ শতাংশ মহার্ঘভাতাকে মূল বেতনের সাথে যুক্ত করে নিয়ে, প্রকৃত বৃদ্ধির হিসাব করলে দেখা যায়, গড় বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ১৪.৫ শতাংশ। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দাবির সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশকে কেন্দ্র করেও একই ধরনের অসন্তোষ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দানা বেঁধেছিল। কেন্দ্রে তখন বামপন্থীদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ইউ পি এ-১-এর সরকার। মূলত বামপন্থীদের প্রস্তাব মেনেই ৪০ শতাংশ 'বুস্টিং'-দিয়ে বেতনক্রম নির্ধারিত হয়েছিল। যা পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের বেতন কমিশনও অনুসরণ করে। বর্তমানে কেন্দ্রে বামপন্থীদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল কোনো সরকার নেই। সংসদে সদস্য সংখ্যার নিরিখে বামপন্থীরা অনেকটাই দুর্বল। ফলে সংসদের অভ্যন্তরে

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

ষষ্ঠ রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে আগামী সংগ্রামে শামিল হোন

বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগ্রাম সফল করার লক্ষ্যে আমাদের কর্মী-নেতৃত্বকে আরো আত্মত্যাগী, সাহসিকতার মনোভাব নিয়ে এগোতে হবে, না হলে কোন দাবি অর্জন করা যাবে না। ২০১১-র পরিবর্তনের পর থেকে রাজ্যজুড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তথা শ্রমজীবী মানুষের ওপর যে আক্রমণ নেমে এসেছিল, মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনও সেই আক্রমণের বাইরে ছিল না। সংগঠন ভাঙার লক্ষ্যে নিয়মনীতিহীনভাবে বদলী, সংগঠন দপ্তর দখল যেমন হয়েছে তেমনি মিথ্যা মামলা, জরিমানার মত ঘটনাও ঘটেছে যা রাজ্যজুড়ে সার্বিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বহু লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার আজ আক্রান্ত। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার প্রাপ্ত অধিকার নস্যাৎ করে বকেয়া আজ ৫৪ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন ও সেই বেতন কমিশনের রিপোর্ট ইতোমধ্যে জমা পড়লেও, বর্তমান রাজ্য সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভাবে উদাসীন। সার্বিক এই আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে দাবি অর্জন করতে হলে ধারাবাহিক আন্দোলন ছাড়া আর কোনও পথ নেই। আক্রান্ত কৃষকেরা রক্তাক্ত হয়েও নবান্ন অভিযানে শামিল হচ্ছেন, ১১৩টি গণ সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ বি পি এম ও-র ডাকে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের জাঠা কর্মসূচীতে ব্যাপক অংশের সাধারণ মানুষ আক্রান্ত-রক্তাক্ত হয়েও প্রতিবাদ-প্রতিরোধে শামিল হচ্ছেন। রাজ্যজুড়ে বিরাজমান এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক শক্তির অংশ হিসাবে মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের কর্মী-নেতৃত্বকেও লাগাতার লড়াই আন্দোলনে শামিল হতে হবে কর্মচারীদের স্বার্থে, নিজের স্বার্থে, পরিবারের স্বার্থে। সপ্তদশ রাজ্য কাউন্সিলের ষষ্ঠ সভায় এই আহ্বান জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ।

মনোজ কান্তি গুহ

অসিত ভট্টাচার্য

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক রাজ্য কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ ষষ্ঠ সভা ২১-২২ নভেম্বর ২০১৫ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন সভাপতি অশোক পাত্র এবং সহ-সভাপতিদ্বয় চন্দন ঘোষ ও চুনীলাল মুখার্জীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অশোক পাত্র কর্তৃক শোকপ্রস্তাব উত্থাপন ও নীরবতা পালনের পরবর্তীতে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায় সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ বলেন, বৃহত্তর সংগ্রাম পরবর্তীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কাউন্সিল সভা। ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে দাবি সনদে অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের প্রিয় সংগঠন ও যৌথমঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটকে সফল করতে উদ্যোগ গ্রহণ, সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সমস্ত ব্লকে সফরসূচী গ্রহণ এবং একে কেন্দ্র করে নিবিড় ও ধারাবাহিক প্রচার কর্মসূচী দারুণ সাফল্য লাভ করেছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে বিভিন্ন জেলায় যৌথমঞ্চের জেলা কনভেনশন, কলকাতায় কেন্দ্রীয় ভাবে ১৩ আগস্ট '১৫ যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সমাবেশ, মুখ্যসচিবের নিকট ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান এবং জেলাগুলিতে জেলাশাসকদের নিকট ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান কর্মচারী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ও জেলা সদরে/মহকুমায় পথসভা, মিছিল, ২৮ আগস্ট '১৫ রাণী রাসমনি এভিনিউ থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিল, নবান্নের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক রক্তচক্ষু এড়িয়ে ধর্মঘটের প্রচারপত্র বিলি এবং মুখপত্র সমূহ, মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার প্রচারের ক্ষেত্রে বাড়তি মাত্রা যুক্ত করেছে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মঘটের সাফল্যের প্রশ্নে বিগত ধর্মঘটগুলির তুলনায় কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে। নবীন কর্মচারীদের একটা বড় অংশ এবারেই প্রথম ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা সাহসিকতার সঙ্গে প্রশাসনের আক্রমণকে মোকাবিলা করেই ধর্মঘট করেছেন যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু সামগ্রিক ভয়-ভীতির পরিবেশ এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার উপাদান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রশ্নে আমাদের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সাধারণ কর্মচারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাগাতার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে আক্রমণও ভোঁতা হবে যা ২৮ ফেব্রুয়ারি '১২ থেকে ২ সেপ্টেম্বর '১৫ বিভিন্ন সরকারী আদেশনামায় দেখা গেছে।

ধর্মঘট পরবর্তীতে ১০ সেপ্টেম্বর '১৫ রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচী, মুখ্যমন্ত্রীর ৫ দফা কর্মচারী দরদী(!) ঘোষণার পরবর্তীতে যৌথমঞ্চের আহ্বানে ২১-২৪ সেপ্টেম্বর '১৫ দপ্তরে দপ্তরে প্রচারপত্র বিলি ও বিক্ষোভ সভা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিগত পঞ্চম কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ছিল জুলাই '১৫-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলি সদস্য নবীকরণের কাজ শেষ করবে। কিন্তু অক্টোবর '১৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নবীকরণের কাজ আমরা এখনও সম্পূর্ণ করতে পারিনি। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আমরা সর্ববৃহৎ সংগঠন হলেও, মর্যাদার প্রশ্নে আমাদের বিচ্যুতি না ঘটলেও আত্মসন্তুষ্ট না হয়ে নবীকরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সমস্ত সমিতিকে একযোগে নবীকরণ ও মুখপত্রের গ্রাহকভুক্তি সম্পূর্ণ করতে উদ্যোগী হতে হবে।

বিগত কাউন্সিলে গৃহীত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সংগঠন তহবিল সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচীর ক্ষেত্রে এখনও অনেক কর্মচারী-বন্ধুর কাছে পৌঁছানোর কাজ বাকি থেকে গেছে। অবিলম্বে এই কর্মসূচীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে সমাপ্ত করতে হবে কারণ এই তহবিল আগামী লড়াই আন্দোলনে রসদ যোগাবে। রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতিকে এই তহবিলের প্রশ্নে উদাহরণ সৃষ্টির জন্য অভিনন্দন। সংগঠনের সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রশ্নে তিনি বলেন, নবীকরণ ও ধর্মঘটের প্রশ্নে অনেকটা অগ্রগতি ঘটলেও সংগঠন কাঠামোগুলির নিয়মিত ফাংশনিং-এর প্রশ্নে উন্নতির অবকাশ রয়েছে।

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

অভিনন্দন!

রাজ্য জুড়ে সংগঠন তহবিল সংগ্রহের কর্মসূচীতে কর্মচারী বন্ধুদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতা সহ প্রতিটি জেলাতেই স্বতস্ফূর্তভাবে কর্মচারীরা এগিয়ে আসছেন। এখনও যে সমস্ত কর্মচারী বন্ধুর কাছে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি তাদের কাছে দ্রুত পৌঁছতে হবে। সংগঠনের প্রতি কর্মচারীরা যে আস্থা জ্ঞাপন করছেন তার জন্য আমরা অভিভূত।

আমাদের দাবি

- অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন কর
- বকেয়া ৫৪% মহার্ঘভাতা প্রদান কর
- চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত করতে হবে
- নীতিহীন হয়রানিমূলক বদলী বন্ধ কর
- ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুনিশ্চিত কর এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখো

দাবি আদায়ে ১-২ ডিসেম্বর '১৫ দপ্তরে দপ্তরে টিফিন-বিরতিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচী সফল করুন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

দাবি ব্যাজে উল্লিখিত পাঁচ দফা দাবি নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচী চলছে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর প্রতিটি জেলা /অঞ্চলে এই দাবিগুলি নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বিশাল সমাবেশ। এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হোক।

সংগ্রামী হাতিয়ার

নভেম্বর ২০১৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৪ তম বর্ষ □ সপ্তম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

অসহিষ্ণুতা—একটি অন্য বিতর্ক

'অসহিষ্ণুতা' এই মুহূর্তে আমাদের দেশে সংবাদের শিরোনামে। প্রায় প্রতিদিনই মুদ্রণ এবং বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, চর্চা-পাল্টা চর্চা চলছে। পিছিয়ে নেই সোশ্যাল মিডিয়াও। এই সামগ্রিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে যে অসহিষ্ণুতার প্রসঙ্গটি, তা মূলত ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। তবে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার চৌহদ্দির বাইরে আরও বিভিন্ন ধরনের অসহিষ্ণুতাও আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল, যেগুলিও প্রায় নিয়মিত ব্যবধানে সংবাদ মাধ্যমের জায়গা দখল করে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বর্শা দিয়েই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষকে কেটে দু'টুকরো করা হয়েছিল। আত্মপ্রকাশ করেছিল দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। তাই জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এই দুই রাষ্ট্রের কণ্ঠলগ্না। তবে তফাৎও ছিল। পাকিস্তান নামক নবগঠিত রাষ্ট্রের কর্ণধাররা একে সযত্নে লালন করার জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন, আর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতাগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল মর্মবস্তুকে আত্মস্থ করে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড থেকে বিযুক্ত করার প্রগতিবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণই তো যথেষ্ট নয়। তাকে আক্ষরিক অর্থে কার্যকরী করার উদ্যোগটাও ছিল জরুরি। বিশেষত, যেখানে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নবজাতক রাষ্ট্রের শরীরে দগদগে ক্ষতের মতো জুড়ে ছিল। যা করলে উদ্যোগটা সফল হতে পারত, তা হল ধর্মকে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত আচরণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা এবং রাজনীতির সাথে এর মিশ্রণের যে কোনো সম্ভাবনাকে কঠোর হাতে দমন করা। কাগজে-কলমে, বক্তৃতায় শাসকশ্রেণী ধর্মাচরণ আর রাজনীতিকে দূরে রাখার কথা যে বলেনি তা নয়, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা বারবার তাদের গ্রাস করেছে। কখনও কখনও ক্ষুদ্র স্বার্থে একে পরোক্ষে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ফলে সময়ের সাথে সাথে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সমাজ-জীবন থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পরিবর্তে, তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলতেই থেকেছে। আর এই আগুনের আঁচে হাত সেঁকেছে তারা, যাদের রাজনীতির উপজীব্যই হল ধর্মাশ্রিত। এই ধর্মাশ্রিত রাজনীতির প্রবক্তাদের কখনও প্রচ্ছন্ন বা কখনও প্রত্যক্ষ মদতে বা ইন্ধনে, স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম তিন দশকের বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ন্যক্কারজনক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। তথাপি ঘটনাগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন, তাৎক্ষণিক উত্তেজনাপ্রসূত এবং চরিত্রগতভাবে 'লোকালাইসড্'। রাষ্ট্র কখনও এইসব ঘটনাবলীর পক্ষ অবলম্বন করেনি বা ধর্মাশ্রিত রাজনীতির পাণ্ডারাও, রাষ্ট্র ক্ষমতাকে তাদের হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জায়গায় ছিল না।

অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পর্বে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে খর্ব করে, দেশি-বিদেশি বেসরকারী পুঁজিকে উৎসাহ প্রদানের যে উদারবাদী দর্শন, সেই দর্শনের প্রতি দায়বদ্ধতা, আনুগত্য প্রদর্শনে দেখা গেল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজনৈতিক শক্তির তুলনায়, ধর্ম আশ্রিত রাজনীতির পাণ্ডারা এক কদম এগিয়ে। ফলে এযাবৎকাল যা ছিল তাদের কাছে অধরা, সেই শাসক শ্রেণীর সমর্থন ও 'স্পনশরশিপ'-এর তারাও হক্‌দার হয়ে উঠল। বরং সময় বিশেষে শাসকশ্রেণীর ট্র্যাডিশনাল পছন্দের শক্তিকে তারা অনেকটাই পিছনে ফেলে দিল। ঠিক যেমনটা ঘটল গত লোকসভা নির্বাচনে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরে বিনষ্ট না করে, তাকে জিইয়ে রাখাতো হয়েছিলই, উপরন্তু উদারবাদী অর্থনীতির স্বার্থে ঐ বিষবৃক্ষের গোড়ায় সার ও জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে ঝড়ের গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে বিষবৃক্ষ। বিশাল আকৃতি বিশিষ্ট সেই বিষবৃক্ষের ফলই বর্তমান বহুল আলোচিত অসহিষ্ণুতা। তবে সুখের কথা বিষবৃক্ষ তার ডালপালার যতই বিস্তার ঘটাক, সমগ্র সমাজকে গ্রাস করার মতো শক্তি অর্জন করতে পারেনি। তাই অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বিশিষ্টজন সহ সাধারণ মানুষও প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন। প্রথিতযশা শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীদের সোচ্চার প্রতিবাদ এবং খেতাব ফিরিয়ে দেওয়ার মতো দৃঢ়তা প্রদর্শন প্রমাণ করে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে এখনও ঘুণ ধরেনি। কিন্তু অসহিষ্ণুতা যে শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করেই তার পেশি শক্তি প্রদর্শন করে তা নয়। জাতপাতের ভিত্তিতে অসহিষ্ণুতার খবরও মাঝে মাঝেই আমাদের নজরে আসে। একবিংশ শতকে 'খাপ' পঞ্চায়েত অসহিষ্ণুতার যথেষ্ট নিদর্শন হতে পারে না কি? অথবা 'ডাইনী' সন্দেহে কোনো গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা করা। এই মধ্যযুগীয় বর্বরতাও কি অসহিষ্ণুতা নয়?

আবার ধর্ম-জাত-পাত ভিত্তিক সামাজিক অসহিষ্ণুতাই যে শুধু আমাদের দেশে দৃশ্যমান তা তো নয়। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার চাষও আমাদের দেশে হয়। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি, তা তো চরম রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতাই। গণতান্ত্রিক অধিকার, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ তো রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতাই। তবে এখানেও সাধারণ মানুষ তো বটেই, বিশিষ্ট জনেরাও প্রতিবাদ করছেন। কিন্তু একথাও বলা দরকার, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা যেমন দেশব্যাপী আলোড়ন তৈরি করেছে, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে 'এটা ঐ রাজ্যের ব্যাপার', 'ওটা রাজনৈতিক দলগুলির বিষয়' প্রভৃতি এড়িয়ে চলার মানসিকতাও কাজ করে। অথচ রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে, দুর্বল হয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হলে সমস্ত ধরনের অসহিষ্ণুতা ইচ্ছে মতো পাখনা মেলতে থাকে। বিশিষ্টজনেরা এটা বোঝেন। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা সম্পর্কে নীরব থেকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা দুঃখজনক।

এ তো গেল অসহিষ্ণুতার বিচিত্র রূপের প্রসঙ্গ, যা সমাজকে ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে। কিন্তু সব ধরনের অসহিষ্ণুতাই কি পরিত্যজ্য। প্রয়োজন কি নেই অসহিষ্ণুতার? হ্যাঁ, আছে। উদারবাদী অর্থনীতির পর্বে, আত্মঘাতি কৃষকের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। যে নীতি কৃষককে তাঁর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মূল্যটুকুও ফেরত দেয় না, তার বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতার প্রয়োজন নেই? শ্রম আইন সংস্কার করে শ্রমিক শ্রেণীকে অধিকারহীন করার চেষ্টা হচ্ছে। একে রুখতে হলে অসহিষ্ণুতা তো প্রদর্শন করতেই হবে। মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া। বিনা প্রতিবাদে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম পরানো যাবে? নারীদের সম্মান লাঞ্ছিত হচ্ছে প্রতিদিন। সহিষ্ণু থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানো যাবে? বা একেবারে নিজেদের প্রসঙ্গে যদি প্রবেশ করি। ধারাবাহিক অসহিষ্ণুতা আমরা প্রদর্শন করেছিলাম বলেই তো, রাজ্য সরকার বেতন কমিশন গঠন করার পথে যেতে বাধ্য হল।

তাহলে কোন্ অসহিষ্ণুতা বর্জনীয় আর কোন্‌টি কাম্য তা নির্ধারণে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা প্রয়োজন। যে অসহিষ্ণুতা সমাজ তথা মানুষের স্বার্থবিরোধী, তাকে প্রতিহত করা, আর যা মানুষের অধিকার অর্জন ও রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য, তাকে প্রদর্শন করা জরুরী। তাই 'অসহিষ্ণুতা' স্থান-কাল-পাত্র-বিষয় নিরপেক্ষ কোনো মানবিক বৈশিষ্ট্য নয়। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে এর প্রয়োগে বিচক্ষণতা জরুরী। □

৩০ নভেম্বর, ২০১৫

'বাহারে বাংলা'

মাননীয় অতিথিবর্গ,

আপনাদের সকলকে এই চতুর্থ 'বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলন'-এ সাদর অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানাই। আশা করি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে এবং ভুটান, সিঙ্গাপুর প্রমুখ বিদেশ-বিভুঁই হইতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া হুগলী জেলার অভ্যন্তরে সিঙ্গুরের এই সম্মেলন স্থলে পৌঁছাইতে বিশেষ কোন সমস্যা হয় নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি আপনারা ক্লান্ত অথবা অবসন্ন বোধ করেন, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমাদের ''বাইক আরোহিত 'ভাই' বাহিনী'' রূপী স্বেচ্ছাসেবকদিগের সহিত যোগাযোগ করিবেন। তাহারা আপনাদের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য এলাহি ব্যবস্থাপনা করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীযুক্ত মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত অধিকারি নামক দুই রত্ন বিশেষ এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্বে রহিয়াছেন। আপনারা প্রয়োজনে তাঁহাদের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। তাহা হইল সম্মেলনস্থল পরিত্যাগ করিবার পূর্বে আপনারা সকলেই আপনাদের চলভাষ নম্বর 'মণ্ডল-অধিকারি অ্যাণ্ড কোম্পানির' নিকট প্রদান করিতে ভুলিবেন না। কারণ কবি বলিয়াছেন, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে ...'। সুতরাং আজ আপনাদের খাতিরযত্ন করিবার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা সুদে-মূলে উসুল করিবার জন্য যাহাতে তাঁহারা আপনাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন, সেই কারণেই চলভাষ নম্বরগুলি বিশেষ জরুরী।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমি উল্লেখ করিব, তাহা হইল শিল্প সম্মেলনের স্থল হিসাবে 'সিঙ্গুর'কে নির্বাচিত করিবার একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য রহিয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা দিল্লি, মুম্বই এবং হলদিয়া শহরে শিল্প সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলাম। কতিপয় শতকোটিপতি শিল্পপতি উক্ত সম্মেলন মঞ্চগুলি আলোকিতও করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্মেলন সমাপনান্তে তাঁহারাও আমাদের বিস্মৃত হইয়াছেন। বঙ্গে শিল্প স্থাপন করিবার জন্য কোন আগ্রহই অদ্যাবধি তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। এক বাক্যে ঐ সম্মেলনগুলির নীটফল হইয়াছিল শূন্য। বঙ্গে শিল্প স্থাপনে শিল্পপতিগণের অনাগ্রহ দেখিয়া আমরা বিন্দুমাত্র ব্যথিত হই নাই। কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্পস্থাপনের লক্ষ্যপূরণ করিবার জন্য ঐ সম্মেলনগুলির আয়োজন করা হয় নাই, ঐগুলি ছিল বহুবিধ উৎসবের ন্যায় অন্যতম উৎসবমাত্র। কিন্তু এই সরল সত্যটি সংবাদমাধ্যম উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাহারা বিস্তর শোরগোল সৃষ্টি করিয়াছিল। এবংবিধ জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন সত্ত্বেও কেন শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহা লইয়া 'সম্পাদকীয়', 'উত্তর-সম্পাদকীয়' নিবন্ধে কর্কশ বাক্যবাণে আমাদের যৎপরোনাস্তি বিদ্ধ ও বিব্রত করিয়াছে। অতএব বর্তমান সম্মেলন স্থল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। জনগণ ও সংবাদ মাধ্যমের নিকট যাহাতে কোনরূপ ভ্রান্ত বার্তা না পৌঁছায়, যাহাতে তাঁহারা পুনরায় বিভ্রান্তির শিকার না হন, সেই কারণে এমন একটি স্থল আমরা নির্বাচন করিয়াছি যাহার পরিচয়ই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যর দ্যোতক। পশ্চিমবাংলার সমগ্র শিল্পমানচিত্রকে মরুভূমিতে পরিণত করিবার উদ্যোগতো সিঙ্গুর হইতেই শুরু হইয়াছিল কিনা!

তৃতীয় প্রসঙ্গ হইল, শিল্প সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য হেভিওয়েট কোন ব্যক্তির প্রয়োজন রহিয়াছে। এমনিতে এইবঙ্গে বর্তমানে 'ভূষণ' বা 'বিভূষণ' উপাধি প্রাপকের অভাব নাই। তাঁহারা সকলেই 'হেভিওয়েট'। কিন্তু 'ভগিনী শুভ্রনীলা'র অভিমত হইল ব্যতিক্রমী চরিত্রের একজন 'হেভিওয়েট' প্রয়োজন। কিয়ৎদিন পূর্বে সন্ধ্যায় নবান্নের পঞ্চদশ তলের ছাদে পদচারণা করিতে করিতে তিনি এমন একটি নাম খুঁজিয়া পাইয়াছেন যাঁহাকে সভাপতির আসনে বৃত করিলে একটি প্রস্তর খণ্ডে অনেকগুলি পক্ষী ধরাশায়ী হইবে। যিনি আক্ষরিক অর্থেই 'হেভিওয়েট'। বিগত প্রায় একটি বৎসর হাসপাতালে ও কিয়ৎদিন কারাগারে বাস করিলেও তাঁহার শারীরিক ওজনের ইতরবিশেষ হয় নাই। দ্বিতীয়ত, সভাপতির ন্যায় একটি সম্মানজনক দায়িত্বপ্রদান করিয়া তাঁহাকে খুশি করিতে পারিলে, তাঁহার উদরে সঞ্চিত বহু গোপন তথ্য মুখঃগহ্বর হইতে নিঃসৃত হইবার সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে। তৃতীয়ত, তাঁহার সহিত ভগিনীর দূরত্ব সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ মাধ্যম যে 'আষাঢ়ে' গল্প ফাঁদিতেছে, তাহারও সমুচিত জবাব প্রদান করা যাইবে।

এক্ষণে একটি সমস্যা আপনাদের মনোজগতে উদিত হইতে পারে, তাহা হইল, মন্ত্রিত্ব ঘুচিবার পশ্চাতেও এমনতর মহাসমারোহে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে, পুনরায় 'প্রভাবশালী' তত্ত্ব ভাসমান হইতে পারে। আমি আপনাদের সংগোপনে বলিতে পারি, ইহা আমাদের নিকট কোন সমস্যাই নহে। উপরন্তু ইহা হইলেই আমাদের মঙ্গল।

চতুর্থ এবং সর্বশেষ প্রসঙ্গ হইল উক্ত সম্মেলনের অন্তর্বস্তু ও নামকরণের বিষয়টি। নামকরণ করা হইয়াছে 'বাহারে বাংলা'—যাহা দ্ব্যর্থবোধক। একটি অর্থ হইল বাংলায় বসিয়াই দেশ ও বিশ্ব দর্শন করিবার সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ বাংলার অভ্যন্তরেই বিদ্যমান রহিয়াছে গোয়া, লন্ডন এবং সুইজারল্যান্ড! অর্থাৎ বাহারে(!) বা বাহবা নিশ্চিতভাবেই বাংলার প্রাপ্য।

দ্বিতীয় অর্থটি এই সম্মেলনের অন্তর্বস্তুর সহিত জড়িত। তাহা হইল 'শিল্প'-র ভিন্নার্থবোধক সংজ্ঞা নির্ধারণ। মদীয় কর্ণধার 'ভগিনী শুভ্রনীলা'-র মস্তিষ্কপ্রসূত এই সংজ্ঞা ইতোমধ্যে গণহেঁচকির কারণ রূপে আন্তর্জাতিক শিল্প মহলে স্বীকৃত হইয়াছে। এই সম্মেলনে উক্ত সংজ্ঞাটিকে আরও পরিণত ও মণ্ডিত অবয়ব প্রদান করা হইবে। অভূতপূর্ব চিন্তার সূত্রপাত হইয়াছিল তেলেভাজা শিল্প গড়িয়া তুলিবার আহ্বান প্রদানের মধ্য দিয়া। কিন্তু কেবলমাত্র তেলেভাজা শিল্পের সম্প্রসারণ উপভোক্তাদের অভ্যন্তরে 'অ্যাসিডিটি'র সমস্যা বৃদ্ধি করিতেছে। অথচ ঔষধালয়গুলিতে 'অ্যান্টাসিড' অমিল। কারণ বিগত কতিপয় মাস সমস্ত 'অ্যান্টাসিড'-এর গ্রাহক ছিলেন এই সম্মেলনের প্রস্তাবিত সভাপতি। সুতরাং মুড়িভাজা শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটাইলে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে, তেমনই 'অ্যাসিডিটি'র সমস্যাও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। কারণ মুড়ি হইল মোক্ষম 'অম্লনাশক'।

এই প্রসঙ্গে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ করিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। তাহা হইল মুড়িভাজা ও তেলেভাজা উদরস্থ করিয়া চিরকালের অভ্যাস অনুযায়ী দয়া করিয়া 'চা' চাহিবেন না। কারণ চা বাগানগুলিতে যাইবার মতন বুকের পাঁটা আমাদের নাই। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, ধন্যবাদ। □

১৩, অগ্রহায়ণ, ১৪২২

ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টদের গণডেপুটেশন

ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টদের জরুরি ১৪ দফা দাবিতে গণডেপুটেশনের কর্মসূচী পালিত হল গত ২৪ নভেম্বর ২০১৫ কলকাতার বিধাননগরের প্রাণী সম্পদ (গো সম্পদ) বিকাশ ভবনে। সারা রাজ্য থেকে প্রচুর সংখ্যক কর্মচারী বন্ধু ঐ দিনের সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। গণডেপুটেশন উপলক্ষে যে কর্মচারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সুদীপ কুমার নন্দী ও দুলাল চন্দ্র ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ প্রয়োগ করা, ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টদের হয়রানিমূলক বদলি বন্ধ করা, ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টদের জন্য ফার্মাসি কাউন্সিল গঠন করা, ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টদের ৫ঃ৪ঃ১ হারে পদোন্নতির নীতি চালু, আপ-টু-ডেট গ্রেডেশন লিস্ট প্রকাশ করা, ডিপ্লোমা হোল্ডার কোর্সকে প্রাণী সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় নিয়ে আসা প্রভৃতি দাবি নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়ে তিন মাস জুড়ে ব্লক স্তর, জেলা স্তরে আন্দোলনের শেষে এদিনের গণ ডেপুটেশনের কর্মসূচীতে কর্মচারীরা মিলিত হয়েছিলেন।

সমাবেশে দাবিপত্র উত্থাপন করেন দেবব্রত দরবার। দাবির পক্ষে বক্তব্য রাখেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। এছাড়াও দাবির পক্ষে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ এবং যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য। এছাড়া লবনহ্রদ অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক পিনাকী সেনগুপ্তও বক্তব্য রেখেছেন কোন পরিস্থিতিতে এই সমাবেশের আয়োজন করতে হয়েছে।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে। কর্মচারীসহ জনসাধারণের দাবি দাওয়া প্রতিদিন উপেক্ষিত হচ্ছে। আবার দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই আন্দোলন করলেই, তার উপর আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে আসছে। এই স্বৈরতান্ত্রিক সরকার রাজ্যে আসীন থাকলে কর্মচারীদের কোনো দাবি দাওয়াই মিটবে না। ফলে রাজ্যের এই স্বৈরতান্ত্রিক বাতাবরণকে দূর করার জন্য আমাদের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে হবে। কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই এই সরকারের নেই। কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য ত্রুটিপূর্ণ সপ্তম বেতন কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়লেও রাজ্য কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আবার পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশ ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ কোথায় আছে সেটা কেউ জানে না। অথচ পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশের কিছু অংশ লাগু করে নিজের সরকারের কৃতিত্ব জাহির করছে। ফলে আরও দীর্ঘ এবং কঠিন লড়াই সংগ্রামের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

এদিন প্রাণী সম্পদ অধিকারের যুগ্ম-অধিকর্তা (হেড কোয়ার্টার) ডঃ মিন্টু চৌধুরীর কাছে ডেপুটেশন দেন সমিতির চারজনের এক প্রতিনিধি দল। স্মারকলিপি প্রদানের পরবর্তীতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সিংহ জানান, বেশিরভাগ দাবি সম্পর্কেই যুগ্ম-অধিকর্তা সহমত পোষণ করেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায় কোনো দাবিই আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দাবিগুলিকে আদায় করতে হলে আরও লড়াই করতে হবে আমাদের। □

প্রণব কর

বি পি এম ও-র ডাকে রাজ্যের গ্রাম-শহরে

আক্রান্ত-রক্তাক্ত হয়েও সব বাধা ঠেলে জাঠার জয়যাত্রা

লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, নিত্যবিদ্ধ জীবনযন্ত্রণা থেকে উঠে আসা মানুষের অধিকার রক্ষা — ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ না হতে দেওয়ার সাথে রাজ্যের ৭৭ হাজার বুথ এলাকায় সমাজের সর্বাংশের মানুষের অংশগ্রহণে ঐক্যবদ্ধ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল ১৪ই নভেম্বর থেকে এক সপ্তাহব্যাপী।

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী সহ জীবন নির্বাহের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্যাবৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধির বাতাবরণ এবং রাজ্যে তৃণমূল সরকারের স্বেচ্ছাচার ও জনবিরোধী নীতি, গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নগ্ন আক্রমণের প্রেক্ষাপটে মানুষের অধিকার রক্ষা, রুটি-রুজির সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে গড়ে উঠেছে ১১৩টি গণ সংগঠনের যৌথ মঞ্চ বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অব মাস্ অর্গানাইজেশনস বা সংক্ষেপে বিপিএমও। এই যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্তরে কনভেনশন করে মানুষের স্বার্থবাহী জ্বলন্ত দাবিগুলি তুলে ধরা, দাবিগুলি সোচ্চার তুলে ধরে মিছিল সংগঠিত করা, জনমত সংগঠিত করার নানা কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে। এবারে আরো বৃহত্তর পর্যায়ে ১৫ দফা গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরে শহরের গলি থেকে রাজপথ, শহরতলির ও নগর এলাকার পথ-ঘাট, হাট-বাজার, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, আলপথ, বনাঞ্চল, চা-বাগান, রাঢ় অঞ্চল রাজ্যের সর্বত্রই জনপদ কম্পিত হয়েছে পদযাত্রীদের পদভারে, সেই সঙ্গে অসংখ্য সভার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে পদযাত্রার উদ্দেশ্য। শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, ছাত্র, যুব, মহিলা, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, লোকশিল্পী, স্বর্ণশিল্পী, শ্রমজীবী মানুষের সব অংশের যৌথ অংশগ্রহণে কী করে একই দাবি তুলে ধরে মানুষকে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানানো যায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষ তা নতুন করে প্রত্যক্ষ করলেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পদযাত্রা যত এগিয়েছে সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ততই বৃদ্ধি করেছে পদযাত্রীদের সংখ্যা। স্থানীয় মানুষই পদযাত্রীদের আহার-বিহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শহর-গ্রামে তোলপাড় করা খেটে খাওয়া মানুষের এই জাঠা শাসকশ্রেণীর বুকে কাঁপন ধরানোয় শাসকশ্রেণীর দুষ্কৃতী, লুম্পেন বাহিনীর দেরী হয়নি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জাঠা মিছিলকে আক্রমণ করতে। লাঠি, বাঁশ, এমনকি বোমাবাজি করে চেষ্টা করা হয়েছে বাহিনীর গতিরোধ করার। রাজ্যের বিরোধী দলের নেতাও রেহাই পাননি তাদের আক্রমণ থেকে। বর্বরোচিত আক্রমণ হয়েছে মিছিলে নেতৃত্বদানকারী প্রবীণ নেতাদের ওপর। গণতন্ত্র হরণকারী এরাজ্যের শাসককুলের কাছ থেকে তাদের ভৈরববাহিনীর কাছ থেকে আক্রমণ আসতে পারে এ চেতনা মিছিলকারীদের পূর্বাহ্নেই ছিল। তাই তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত বাধা-আক্রমণকে প্রতিহত করেই দুর্বার

গতিতে মিছিল এগিয়েছে — জানান দিয়েছে ভবিষ্যতে যত বেশি আক্রমণ হবে — ততই প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। এভাবেই গোটা রাজ্যের মানুষ গড়ে তুলবেন এক নতুন ইতিহাস —জয়ের ইতিহাস।

১৫ দফা দাবি — সব হাতে কাজ চাই, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ হোক ১৩,০০০ টাকা, অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা, চিটফান্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা, চাই খাদ্য সুরক্ষা, কৃষিক্ষেত্রে ভরতুকি প্রত্যাহার না করা, বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করা, শিক্ষায়, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বন্ধ করা, গণতন্ত্র ধ্বংস রোধ, মহিলাদের নিরাপত্তা, বকেয়া বেতন ও পেনশন প্রদান, শ্রমিকবিরোধী শ্রম আইন চালু না করা, বস্তি থেকে উচ্ছেদ নয় — চাই বস্তি উন্নয়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের ও প ব. রাজনৈতিক চাপ বন্ধ ইত্যাদি। এই দাবিগুলিই প্রমাণ করছে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের এই মুহূর্তে জ্বলন্ত সমস্যাগুলি কী কী।

বস্তুতপক্ষে দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘনঘন বিদেশ সফরে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের 'সুদিন' আনার যতই বাগড়ম্বর করুন না কেন দেশের দুর্দশা তাতে বিন্দুমাত্র লাঘব হচ্ছে না, কৃষি উৎপাদনের হার দারুণভাবে কমেছে। গত ৬ মাসে কৃষক আত্মহত্যার পরিমাণ বেড়েছে ২৬ শতাংশ। দেশে কোন ভূমি সংস্কার নেই। এ রাজ্যের পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ, ফসলের দাম না পেয়ে, সেচের জল না পেয়ে, ঋণভারে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ১৬০ জন কৃষিজীবী। চা-বাগান এলাকায় ঘটছে অনাহারে মৃত্যুর মিছিল। খাদ্য নিরাপত্তার নামে আসলে আঘাত হানতে চাওয়া হচ্ছে গোটা রেশনিং ব্যবস্থার ওপর। দেশে কোন নতুন শিল্প হচ্ছে না। এরাজ্যে তো শিল্প-মরুভূমি রাজ। সরকারী-বেসরকারী কোন ক্ষেত্রেই বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। এর উপর কর্পোরেট মুনাফা বৃদ্ধির পক্ষে শ্রমিক-কর্মচারী বঞ্চনার বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে শ্রম সংস্কার তথা আঁটো-সাঁটো "শ্রম আইন" লাগু করার উদ্যোগ চলছে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম মজুরী ১৫০০০ টাকা করার দাবিতে সরকার কর্ণপাতই করছে না। ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘট থেকে কি কেন্দ্র কি এই রাজ্য সরকার কেউই কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইছে না। সাধারণ মানুষ দুই সরকারের ক্রিয়াকলাপেই তিতিবিরক্ত- ক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছেন। সংগঠিত জাঠা মিছিল থেকে সোচ্চার দাবি-শ্লোগানে সেই ক্ষোভেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। শাসকরা সংগঠিত প্রতিবাদকে বিপথগামী করতে, গণতান্ত্রিক চেতনাকে বিভ্রান্ত করতে দেশে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি, উগ্র হিংসা, অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ওপর যা কুঠারাঘাত। যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, উদারচিন্তার প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। খুন হয়ে যাচ্ছেন শ্রদ্ধেয় যুক্তিবাদী চিন্তাবিদরা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শিকার হচ্ছেন অসহিষ্ণুতার। আক্রান্ত হচ্ছে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার ঘটনা তো এ রাজ্যে আকছার ঘটে চলেছে।

অথচ বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে গালভরা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নেতা-নেতৃত্বের বক্তৃতায় — নির্বাচনী ইশ্তেহারে। এখন তো বক্তব্যে

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

বিহার বিধানসভা নির্বাচন

বিহারী বনাম বাহারি ঝড়ে উধাও নমো আফিং

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে 'আচ্ছে দিন' নামক আফিং-এর জেরে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। এই সরকারের একমাত্র অভিপ্রায় হলো তাদের প্রাণভ্রমরা আর এস এস-র পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্রকে গোঁড়া অসহিষ্ণু ফ্যাসিস্ত মনোভাবাপন্ন 'হিন্দু রাজ্য'-এ পরিবর্তিত করা। ফলে নির্বাচনী প্রচারের সময়ে তিনি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। মাত্রাছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের অবক্ষয়, কৃষি সংকট গভীর থেকে গভীরতর হওয়া, দেশের অর্থনীতিকে বিদেশিদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া এখন 'আচ্ছে দিন'-কে ক্রমশ 'বুরে দিন'-এ পরিণত করছে এবং প্রতি মুহূর্তে মানুষ বুরে দিনকে উপলব্ধি করতে পারছেন।

'নমো আফিং'-এর ঘোর যে কাটছে তা বোঝা গেছে ন'মাস আগে দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনের ফলে। দিল্লীবাসী বিজেপি-কে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এবার বিহারের মতো একটি বড় রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন সেই নিরিখেই জাতীয় রাজনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুধু দেশের নয়, সারা বিশ্বই উন্মুখ হয়েছিল এই

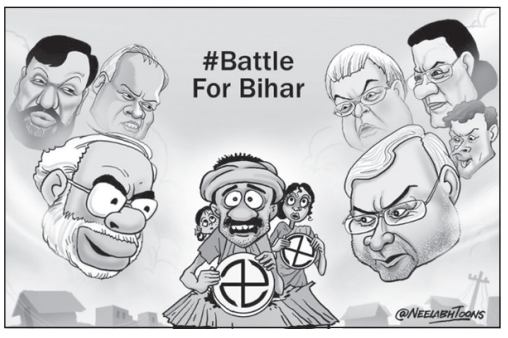

বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে। প্রায় একমাস ধরে পাঁচ দফায় ভোট হয় বিহারে। ভোট প্রচারে বিজেপি মুখে বলেছে — জাতপাত নয়, বিকাশই তাদের ইস্যু। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, এমনকি জাতপাতের অঙ্ক কাজে লাগানোর চেষ্টায় তাদের খামতি ছিল না। প্রচারের মুখ ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে। এই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের বিরুদ্ধে যে মহাজোট বিহারে হয়েছে— আর জে ডি, জে ডি (ইউ) এবং কংগ্রেসের, তাদের মূল স্লোগান ছিল— 'বিহারী বনাম বাহারি'। অর্থাৎ বিহারের উন্নয়নের জন্য বিহারী-ই প্রয়োজন, বাইরের কারোর প্রয়োজন নেই। মোদীর ফাঁপা প্রতিশ্রুতি ও অসহিষ্ণুতার রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বিহার বাসী। সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার নতুন দিশা দেখিয়েছে বিহার, যা জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য এবং এর প্রভাব পড়বে সমগ্র দেশে।

লালুপ্রসাদ যাদব এবং নীতীশ কুমার দু'জনের কাছেই এবারের ভোট ছিল মরণ-বাঁচনের লড়াই। কারণ গত লোকসভা ভোটে দু'জনকেই মোদী হাওয়া প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছিল। রাজ্যের ৪০টি আসনের ৩১টিই পেয়েছিল বিজেপি এবং লালুর আর জে ডি পেয়েছিল ৪টি ও নীতিশের জে ডি (ইউ) পেয়েছিল মাত্র ২টি আসন। তখন অবশ্য জোট ছিল না, মোদীই তাদের কাছাকাছি এনে দিলেন। নব্বই-এর দশকে লালকৃষ্ণ আদবানির রথ বিহারে আটকে দিয়েছিলেন লালু প্রসাদ যাদব। আর এই দশকে মোদীর জয়যাত্রার রথ আটকে দিল লালু-নীতীশের জোট। মহাজোটের এই লড়াইটা কিন্তু খুব সহজ ছিল না। বিহার দখল করতে মরিয়া হয়ে পড়েছিলেন মোদী-অমিত শাহ। দু'মাস ধরে রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন বিজেপি সভাপতি। মোদী নিজে প্রায় ৩০টি-র বেশী প্রচারসভা করেছেন, যা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নজিরবিহীন। সঙ্গে ছিল সংঘ বাহিনী ও খোদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রচার।

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রকৃতিই ভরসা

নগরায়ণের সাথে সাথে মশাবাহিত রোগের প্রকোপও বাড়তে শুরু করেছে। যতদিন যাচ্ছে — নতুন নতুন মাত্রায় রোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাকে প্রতিহত করার পথও খুঁজতে হচ্ছে অতি দ্রুততার সথে। বর্তমানে ডেঙ্গু জ্বর যা ব্রেকবোন ফিভার নামে পরিচিত—আসলে মশাবাহিত ভাইরাস ঘটিত রোগ। এর আক্রমণে মারাত্মক জ্বর হয় এবং রক্তে অনুচক্রিকার মাত্রা কমে যায় ও শরীরে জলের মাত্রাও কমে যায়। সঠিক চিকিৎসা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। আমরা জানি অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে — কিউলেক্স মশা গোদ, এনকেফেলাইটিস রোগ সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও ঈডিস ঈজিপ্টাই নামক মশা ডেঙ্গু রোগের সৃষ্টি করে। ১৭৭৯ সালে প্রথম এই রোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত ১৯৬০ সাল থেকে এর প্রাদুর্ভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। ডেঙ্গু বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশে মহামারীর আকার নিয়েছে। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী প্রাণঘাতী ডেঙ্গু হেমোর‍্যাজিক ফিভারে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং শরীরে রক্তপাত হতে থাকে ও অনুচক্রিকার মাত্রা কমে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। তাই প্রথমেই রোগ নির্ধারণ ও সঠিক চিকিৎসা বাধ্যতামূলক। ডেঙ্গু রোগ হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে জানার জন্য ELISA পদ্ধতিতে NS1অ্যান্টিজেন এবং IgG, IgM অ্যান্টিবডি পরীক্ষা জরুরী (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত)। হঠাৎ জ্বর, সঙ্গে প্রচন্ড মাথা ব্যথা, র‍্যাশ, নাক, মুখ ও পায়খানার সঙ্গে রক্তক্ষরণ — এই জাতীয় উপসর্গ থাকলেই দ্রুত চিকিৎসা করান প্রয়োজন।

বিগত কয়েক বছর ধরে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। প্রতি বছরই কিছু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। শুধু যে ডেঙ্গু তা নয়, বিভিন্ন ধরনের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, যার বাহক মূলত মশা। কলকাতার ভাইরাস বিশেষজ্ঞগণ বলছেন জ্বরের লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে ডেঙ্গুর নয়া ভাইরাস হানা দিয়েছে। প্রাথমিক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ মৃত্যুই বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ রীতিমত চিন্তিত। কলকাতার নামী সংস্থা স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন-এ ডেঙ্গুর নয়া ভাইরাস সনাক্তকরণের জন্য যে পরীক্ষার প্রয়োজন সেই পরিকাঠামো নেই। ফলে তা বাইরের রাজ্য থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে এই বছর এ পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৯৯২ জন আক্রান্ত হয়েছে শুধু কলকাতায়। গত কয়েকদিনে কলকাতার বেসরকারী হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির পরিসংখ্যান বলছে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি, সরকারী পরিসংখ্যানে আসল চিত্রটা উঠে আসছে না। গত কয়েকদিনে বরাহনগরের দুই গৃহবধূ এবং লবণহ্রদ জি ডি ব্লকের নাট্যকর্মীর ডেঙ্গুতে মৃত্যু বিশেষজ্ঞদের ভাবিয়ে তুলেছে। এই মহিলারা সকলেই কম বয়সী। বিশেষ করে বরাহনগরের দুই গৃহবধূর প্রথমবার ডেঙ্গু আক্রমণেই মারাত্মক পরিণতি ঘটল। এদের দুজনের ক্ষেত্রেই NS1পজিটিভ হলেও তাঁদের রক্তে IgG অ্যান্টিবডি না পাওয়ার জন্য এমনটাই মনে করছেন রাজ্যের ভাইরাস বিশেষজ্ঞরা। কলকাতার বিশিষ্ট ভাইরাস বিশেষজ্ঞ বলছেন এবছরই প্রথম দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক ডেঙ্গুতে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এবং সামান্য জ্বরেই রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। বিশেষজ্ঞের মতে হয়ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেরো টাইপ টু'র ডেঙ্গু ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটছে। অথবা কোন ভাইরাসে প্রজাতি জিনগত ভাবে নিজেকে আমুল বদলে ফেলেছে। সাধারণত মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপের সন্ধান মেলে ভারতে। এই চারটে সেরোটাইপের মধ্যে রয়েছে ১৭ রকমের সাবটাইপ। প্রত্যেকটি আলাদা রকমের ভাইরাস প্রজাতি এবং প্রত্যেক রকমের সংক্রমণ আলাদা ধরনের।

কলকাতা শহর ও শহরতলিতে এই সময়কালে ডেঙ্গু কার্যত

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

জাতির মানসিক গঠনের উপর বিপজ্জনক প্রভাব পড়বে ঃ ইরফান হাবিব

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ফ্রন্টলাইন পত্রিকার অক্টোবর ১৬, ২০১৫ সংখ্যায় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবের এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন অজয় আশীর্বাদ মহাপ্রশস্থ। বর্তমান সময়ে এর অপরিসীম প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে, অনুবাদ আকারে প্রকাশ করা হল। অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম অংশ। দ্বিতীয় তথা শেষ অংশ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। অনুবাদ করেছেন সুমিত ভট্টাচার্য)

প্রশ্ন ঃ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ ঋগবৈদিক যুগের ওপর একটি কর্মশালা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কেন ইতিহাসের একটি বিষয় সম্পর্কে সংস্কৃত বিভাগের এত উৎসাহ? এমনকি জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে কিছু দলিল জনসমক্ষে নিয়ে আসার দাবি করা হচ্ছে, যা হয়ত বা ঋগবৈদিক যুগের সময় সম্পর্কে এযাবৎকালের প্রচলিত ধারণাটিকেই বদলে দেবে। সঙ্ঘপরিবার তাদের ধারাবাহিক প্রচারের মধ্য দিয়ে ঋগবৈদিক যুগকে আরও কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে নিয়ে যেতে চায়, যাতে প্রমাণ করা যায় যে হিন্দু সভ্যতাই প্রাচীনতম সভ্যতা এবং ফলত শ্রেষ্ঠ সভ্যতাও। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণা কি বলে?

ইরফান হাবিব ঃ কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে ঋগবেদের আনুমানিক সময়কে নির্ধারণ করা সম্ভব। আমাদের মনে রাখা দরকার খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সাম্রাট অশোক শিলালিপিতে তাঁর শাসনকালের যে সময় উল্লেখ করেছেন, তার আগে সন-তারিখ গণনা করার কোন পদ্ধতি ভারতবর্ষে চালু ছিল না। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই, বৈদিক স্তোত্রে নিজস্ব কোন তারিখ উল্লিখিত নেই। তাই এগুলি কখন রচনা করা হয়েছিল তা জানার জন্য অন্যকোন পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ঋগবেদে রথ বা অশ্ব-চালিত যানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে একথা বলা যায়, ঐ ধরনের অশ্বচালিত যানের অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরের আগে ছিল না। এমনকি সর্বপ্রথম অশ্ব ব্যবহৃত হয়েছে, রাশিয়া ও কাজাখস্তানে। সুতরাং ঋগবেদের সময় খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরের আগে হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

অপর বিষয়টি হল ভাষা। ঋগ বেদে ব্যবহৃত ভাষা ও আবেস্তান ভাষার প্রচুর মিল রয়েছে। সন-তারিখ ভিত্তিক মেসোপটেমিয় শিলালিপিতে উল্লিখিত ইরানীয় নামের সূত্র ধরে বলা যায় প্রাচীনতম আবেস্তানের সময় খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ বছর। সুতরাং মোটামুটিভাবে ঋগবেদের কাল হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দকে নির্দিষ্ট করা যায় এবং ঋগবেদের সময় ধাতু হিসেবে তামার প্রচলন থাকলেও লোহার প্রচলন ছিল না— এই তথ্যটিও ঐ সময়ের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ। ঋগবেদের সময়কার দেবতা মূর্তিগুলি মনুষ্যরূপী, সিন্ধু সভত্যার দেবতা মূর্তিগুলির ন্যায় পশুরূপী নয় এবং সিন্ধু সভ্যতা ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধ্বংস হয়ে গেছিল, ফলে ঋগবেদের সময়কে এর থেকে বেশি পিছনে ঠেলার কোন সুযোগ নেই। ঋগবেদে জ্যোতির্বিদ্যার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে, সুতরাং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিতে ঋগবেদে নতুন কিছু খুঁজে পাওয়া দুস্কর। অবশ্য ঋগবেদে যা নেই, তাও খুঁজে পাওয়ার দাবি যদি তাঁরা করে থাকেন, তাহলে কিছু বলার নেই।

ঘটনাচক্রে আর এস এস-র তাত্ত্বিক নেতারাও ঋগবেদকে প্রাচীনতম প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন (তাঁদের খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক ভিএস ওয়াকাঙ্কারের দাবি হল ঋগবেদের সময় হল ৮০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ অর্থাৎ প্রস্তরযুগ!)। সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগের ফলাফল যাই হোক না কেন, এটা বোঝাই যাচ্ছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্ডিতদের মধ্যে এখন আর এস এস অনুগামীও রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ দিল্লির ললিতকলা একাডেমি বর্তমানে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এর শিরোনাম হল 'ঋগবেদ থেকে রোবট বিদ্যা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা'। এই প্রদর্শনীর ঘোষিত লক্ষ্য হল, এটা প্রমাণ করা যে রাম একজন ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন, এবং আরও কিছু তত্ত্ব, যেমন কোন এক সময় সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব ছিল এবং সত্যিই মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল। সঙ্ঘ পরিবারের ঐতিহাসিকগণ যে সমস্ত প্রমাণাদি হাজির করছেন, সেগুলির যথার্থতা কতটুকু?

ইরফান হাবিব ঃ সৌভাগ্যবশত অন্যতম রক্ষণশীল ঐতিহাসিক হিসেবে সমধিক পরিচিত প্রয়াত অধ্যাপক ডি সি সরকার রামায়ণ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর 'রামায়ণের সমস্যা' গ্রন্থে তিনি এর অপূর্ব সাহিত্যমূল্যের উচ্চকিত প্রশংসা করলেও, ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক সত্যতাকে সম্পূর্ণ খারিজ করেছেন। ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি, তা ব্রাহ্মণ্যবাদী, ইহুদীয় বা ইসলামিক পরম্পরা যার সাথেই সম্পর্কিত হোক

মুঘল সম্রাট আকবর

না কেন, এর ইতিহাসে কোন স্থান নেই, কারণ বিধৃত ঘটনাবলীর কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। যদিও এই সমস্ত কাহিনীগুলির উৎস অনুসন্ধান করা ঐতিহাসিকদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় একটি বিষয়।

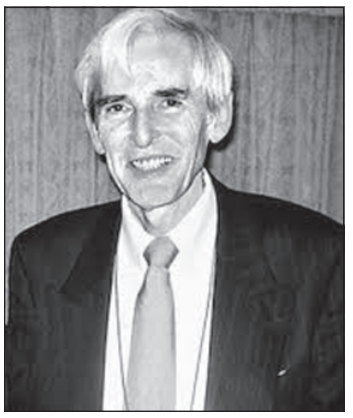

ঐতিহাসিক মাইকেল উইৎজেল

প্রশ্ন ঃ ভারতবর্ষের সর্বত্র মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকার তোড়জোড় শুরু করেছে। এই পদক্ষেপ থেকে মনে হয় হিন্দুরা মাংস খাওয়ার বিরোধী। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মানুষের খাদ্যাভাস বিশেষত মাংস-খাওয়া কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে?

ইরফান হাবিব ঃ ঐতিহাসিকেরা বহুদিন ধরেই অবগত আছেন যে, পশুবলি (গবাদি পশু সহ) বৈদিক ধর্মাচরণের অঙ্গ ছিল। ভারতীয়দের খাদ্যাভাসের পরম্পরায় মাংসের স্থান সম্পর্কে অধ্যাপক ডি এন ঝা প্রচুর প্রাসঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থানের পর গো-হত্যা ও খাদ্য হিসেবে পশু মাংসের ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য বহু নীচু জাতির মধ্যে মাংস খাওয়ার প্রচলন থেকে যায়। এই বিষয়ে এইচ ডি

অধ্যাপক ইরফান হাবিব

সাঙ্কালিয়ার 'ইতিহাসে গরুর স্থান' (সেমিনার, ১৯৬৭) নামে একটি উল্লেখযোগ্য রচনাও রয়েছে। এহ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ নিজে, আমি বিশ্বাস করি, একজন কঠোর নিরামিষাশি ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ইতিহাস অনুসন্ধানে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করা উচিত? এটি কি কোনো অমীমাংসিত তত্ত্বগত প্রশ্ন? এই বিষয়ে বিভিন্ন ধারার প্রচলন রয়েছে যেমন 'দৃষ্টিবাদী', 'উদারবাদী', বর্ষপঞ্জীবাদী (Annales), মার্কসবাদী, নিম্নবর্গীয়, উত্তর-উপনিবেশবাদী প্রভৃতি। হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসবিদগণ তাঁদের যুক্তির অবতারণার ক্ষেত্রে এর মধ্যে কোনো একটি বিশেষ ধারাকে অনুসরণ করে কী? যদি ইতিহাসের শাখায় বিভিন্ন ধারার মধ্যে সুস্থ তত্ত্বগত বিতর্কের সুযোগ থাকে, তাহলে পেশাদার ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের 'হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যার এত বিরোধী কেন?

ইরফান হাবিব ঃ এটা ঠিক ইতিহাস চর্চায় বিভিন্ন ধারার অবস্থান রয়েছে। কিন্তু তার মানে, এটা নয় যে কোনো ব্যাপারেই ঐতিহাসিকেরা একমত হয় না। কোন ধারার ইতিহাসই অস্বীকার করে না যে আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন এবং ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। বা সম্রাট অশোক তাঁর ধর্মোপদেশ প্রাকৃত, গ্রীক এবং আরামাইক ভাষায় প্রচার করেছিলেন।

এটা নিশ্চিত প্রাচীন বস্তুর পর্যবেক্ষণ, প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রা ব্যবস্থার প্রমাণ, রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রাগৈতিহাসিক বস্তুর কাল নির্ণয়, হস্তলিপির পাঠোদ্ধার প্রভৃতির মাধ্যমে যে সত্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে দ্বি-মত পোষণের সুযোগ খুবই কম। দ্বিমত বা বিতর্ক তখনই সাধারণভাবে দেখা যায়, যখন প্রাপ্ত 'সত্যগুলির মধ্যে কোনটি বা কোনগুলি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। আপনি যে ধারার (হিন্দুত্ববাদী) কথা উল্লেখ করলেন, তাঁদের বিচার পদ্ধতি বা ধারণা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণই আলাদা। আপনি যখন দক্ষিণপন্থী শিবিরের কথা বলছেন, তা হিন্দু, মুসলিম বা অন্য যেকোনো তালিকাভুক্তই হোক না কেন, তাঁদের ইতিহাস অনুসন্ধান তখনই বৈধতা পায়, যখন তাঁরা উপরোক্ত স্বীকৃত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করেন। আর.সি মজুমদার এবং ডি সি সরকার হলেন তেমনই ইতিহাসবিদ যাঁরা রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে দক্ষিণপন্থী হলেও, ইতিহাস অনুসন্ধানে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলিই অনুসরণ করেছিলেন।

আপনি 'দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী' নামে যাঁদের অভিহিত করছেন, তাঁরা তো এই ঐতিহাসিক পদ্ধতিগুলিকেই বাতিল করে দিচ্ছে। তাঁরা মজুমদার বা সরকারকে অনুসরণ না করে, মাথায় তুলে নাচছে জনৈক স্বামী ডেভিড ফ্রলে-কে, যিনি কোনো ঐতিহাসিক সূত্র উল্লেখ ছাড়াই, চোখের নিমেষে যে কোনো সত্য হাজির করতে পারেন। সম্ভবত এই অত্যাশ্চর্য দক্ষতার জন্যই তাঁকে সম্প্রতি পদ্মভূষণে সম্মানিত করা হয়েছে। আবার একজন প্রেরণা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব হলেন 'নাসা বিজ্ঞানী' নবরত্ন রাজারাম, যিনি সিন্ধু সভ্যতার অশ্বচিত্র অঙ্কিত একটি মুদ্রা হাজির করে সিন্ধু সভ্যতার আর্যচরিত্র

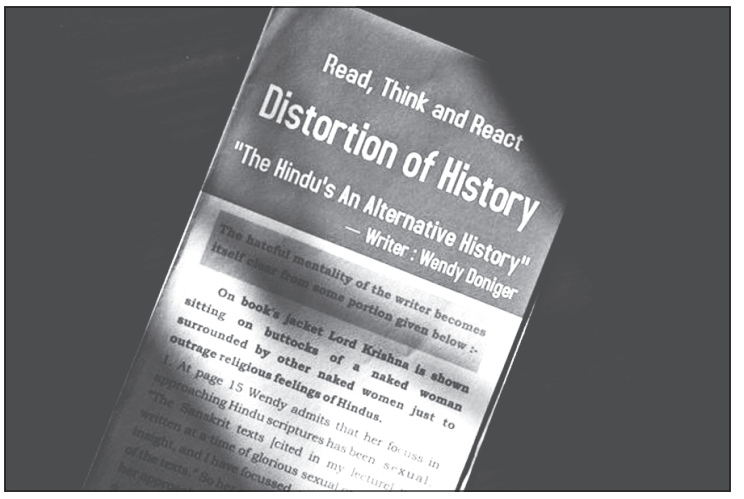

প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আপনাদেরই পত্রিকায় মাইকেল উইৎজেল (হরপ্পায় অশ্বক্রীড়া, ফ্রন্টলাইন, অক্টোবর ১৩, ২০০০) এই ধাপ্পাবাজির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এই ধরনের লোকজনের সাথে বিতর্ক করা মানে সময়ের অপচয়। তবে বিতর্ক একেবারে হয়নি একথা ঠিক নয়। যখনই বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, বিতর্ক হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ দক্ষিণপন্থী ইতিহাসবিদ্দের সিদ্ধান্তগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি? যেমন হিন্দু মহাকাব্যগুলি সম্পর্কে ওয়াই এস রাও যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বা রাকেশ সিন্হা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা করেছেন?

ইরফান হাবিব ঃ আমি যতদুর জানি অধ্যাপক রাওয়ের নিজস্ব গবেষণার ক্ষেত্র ছিল ব্রিটিশ শাসনে উত্তর ভারতের ভূমি ব্যবস্থা। আমি পুরষ্কণ বা মহাকাব্যের ওপর তার কোন কাজ আছে শুনে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আর রাকেশ সিনহা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে কি লিখেছেন, এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই।

প্রশ্ন ঃ কেন দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদীরা বারবার ক্ষমতায় এলেই অন্যান্য বিষয়কে ছেড়ে শুধুমাত্র ইতিহাসকেই তাঁদের লক্ষ্যবস্তু করেন? তাঁরা সব সময়ে বলেন, ভারতে ইতিহাস রচনা বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসীদের দ্বারা প্রভাবিত একপেশে। তাঁরা এই ধারাকে নাকি ভাঙতে চান। আপনার মত কি?

ইরফান হাবিব ঃ আর এস এস অনুগামীদের একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা রয়েছে। তাঁরা 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে খুব গলা ফাটাচ্ছে, কিন্তু এই কাজটা তাঁরা শুরুই করেছে ১৯৪৭-এর পর, যখন পরিস্থিতি অনেক সহজ। যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা জেলে গেছেন বা কষ্ট স্বীকার করেছেন, সেই সময়কালের বলার মতন কোন 'নায়ক' আর এস এস-র নেই। তাঁরা বরং ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দূর্বল করার জন্য 'হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তান' ও 'হিন্দু রাজ অমর রহে'-র মতন শ্লোগান হাজির করেছিলেন। দেশভাগের জন্য তাঁদের এই কার্যকলাপ কি দায়ী নয়? অথচ তাঁরাই এখন দেশভাগের জন্য গান্ধী ও নেহেরুকে দায়ী করছেন। এইসব কারণেই তাঁদের একটা ভ্রান্ত ইতিহাস নির্মাণ করা দরকার, যেখানে তাঁরা নিজেদের জাতীয়তাবাদী হিসেবে জাহির করতে পারেন এবং প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভূমিকাকে খাটো করতে পারেন।

এই বিষয়ে আমি আর বিশদ ব্যাখ্যায় যাব না, কারণ ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ২০০৩ সালের প্রতিবেদন যা ১৩০ পাতার একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেই ইতিহাসের দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদীদের ব্যাখ্যা, যা এন সি ই আর টি অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকগুলিতে স্থান পেয়েছিল, তার বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে। যখন তথ্য প্রমাণের মুখোমুখি হয়ে এটা ধরা পড়ে যায় যে তাদের ইতিহাসের ব্যাখ্যা আজগুবি, তখন আর এস এস ও তাঁদের অনুগামীরা চিৎকার করতে শুরু করে যে ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধান বামপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত এবং তাই ভারতবর্ষ যে আর্যদের আদি বাসভূমি এই তথ্য স্বীকৃত হচ্ছে না। আর সি মজুমদার, তারা চাঁদ, ঈশ্বরী প্রসাদ, এন কে সিন্হা, ডি সি সরকার এবং বি এন মুখার্জি প্রমুখ প্রথিতযশা ইতিহাসবিদগণের মধ্যে কে বামপন্থী তা ওঁদের চিহ্নিত করতে বলা হোক, কারণ এই ইতিহাসবিদ্গণ ইতিহাসের ব্যাখ্যায় নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করলেও, আরএসএস তার ভাগ্যধ্বজা ওড়াতে পারে এমন কোন কথা বলে যাননি। □

নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে বর্তমান সময়

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান বছরটি মহান বিপ্লবের ৯৮তম বর্ষ। ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর কমরেডলেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির পরিচালনায় জারশাসিত রাশিয়ায় মহান নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হয়। এর পরের দিন অর্থাৎ ৮ নভেম্বর সোভিয়েত দ্বিতীয় কংগ্রেস শান্তি বিষয়ক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। এই ঘোষণায় প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনটি বৃহত্তম রাষ্ট্র ব্রিটেন, জার্মানী এবং ফ্রান্সের শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের কাছে এই বলে আবেদন জানানো হয় যে, তারা যেন 'শান্তিকামীদের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত করতে এবং একই সাথে সর্বপ্রকার দাসত্ব ও শোষণ ব্যবস্থা থেকে শ্রমজীবী বঞ্চিত জনসাধারণের মুক্তির প্রচেষ্টাকে' সাহায্য ও সহযোগিতা করে।

এই কংগ্রেসে একই সাথে গৃহীত ভূমি বিষয়ক ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, এই মুহূর্ত থেকেই বিনা ক্ষতিপূরণে জমিতে জমিদারদের সম্পত্তির অধিকার লোপ পেয়ে গেল। পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হল জমির উপর সাধারণ বা রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা।

সমগ্র রুশ বিপ্লবকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরের সময়কাল হল ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই পর্বের মৌলক শ্লোগান ছিল জার এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের নিরপেক্ষ করে সমগ্র কৃষক সমাজকে সাথে নিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই মৌলিক শ্লোগান সমকালীন রুশ দেশের বাস্তব অবস্থায় এবং কৃষকদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছিল। এই সময়ের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই সময়ে কৃষকরা উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রভাবমুক্ত হল। একই সাথে শ্রমিকশ্রেণীও বলশেভিক পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হল।

জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জমি ও স্বাধীনতার দাবিতে ১৯০৫ সালে প্রথম বিপ্লব ঘোষিত হয়। এই আন্দোলনকে বলা হয় রুশ বিপ্লবের প্রভাতী তারা। ঐতিহাসিকদের মতে এই বিপ্লব ছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবের মহড়া। ১৯০৫ সালের এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জারতন্ত্রের ভিত্তি ধসে যায়। ধসে পড়া স্বৈরতান্ত্রিক এই সৌধ ১৯১৭ সালে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। এই পটভূমিতে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবকে একটি হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিপ্লব বলা চলে না।

রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তর ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। এই সময়ে বিপ্লবের মৌলিক শ্লোগান ছিল শহর ও গ্রামের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে গরীব কৃষকদের সাথে নিয়ে সর্বহারাদের ক্ষমতা দখলের জন্য অগ্রসর হওয়া।

প্রথম পর্যায়ে বিপ্লবের সামনে প্রধান সমস্যা ছিল জার ও জমিদারতন্ত্রের উচ্ছেদ। কিন্তু এই পর্যায়ের বিপ্লবের প্রধান সমস্যা যা উপস্থিত হয়েছিল তা হল যুদ্ধ বন্ধের সমস্যা। কারণ অন্তহীন যুদ্ধের জন্যে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; কৃষকরা হয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত। এই যুদ্ধ থেকে সরে আসার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে সোস্যাল রেভলিউশনারি আর মেনশেভিকদের উচ্ছেদ করা। কেরেনেস্কি সরকারের শাসনকালে শ্রমজীবীরা অভিজ্ঞতায় বুঝেছিল যে, সোস্যাল রেভলিউশনারি আর মেনশেভিকরা ক্ষমতায় থাকলে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। তারা উপলব্ধি করল যে, একমাত্র সোভিয়েত শক্তিই দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে। কেরেনেস্কি সরকারের আমলের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা শ্রমিকদের পক্ষে সমবেত হতে সাহায্য করে।

রুশ বিপ্লবের তৃতীয় বা শেষ স্তর শুরু হয় ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে। কমরেড লেনিনের সঠিক নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করে এবং শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র রুশ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

।। এক।।

রাশিয়ায় অপেক্ষাকৃত সহজে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল, যা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমত, জার শাসিত রাশিয়া ছিল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সর্বাধিক দুর্বল গ্রন্থী। এই কারণে রুশ দেশে বিপ্লবের দিকটি লক্ষ্য করে মার্কস-এঙ্গেলস ১৮৮২ সালে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের রুশ সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির আসন্ন অনিবার্য অবলুপ্তির কথা ঘোষণা করা। কিন্তু রাশিয়ায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্রুত বিকাশশীল পুঁজিবাদী, ধাপ্পাবাজী এবং সদ্য বিকাশমান বুর্জোয়া ভূ-সম্পত্তির পাশাপাশি অর্ধেকের বেশি জমির মালিকানা রয়েছে যৌথভাবে কৃষকদের। এখন প্রশ্ন হল : রুশ গ্রামীণ সমাজ অনেকটা ভেঙে পড়া সত্ত্বেও যা জমির আদিম মালিকানা, আদিম যৌথ একটি রূপ বিশেষ, তা সরাসরি উচ্চতর সাধারণ কমিউনিস্ট মালিকানার পর্যায়ে উপনীত হতে পারবে কি? নাকি পক্ষান্তরে তাকে পশ্চিমী দুনিয়ার ধারার ন্যায় একই ধরনের পথ ধরেই এগুতে হবে?

"আজ এর একটি মাত্র উত্তরই সম্ভব। তা হল যদি রুশ বিপ্লব পশ্চিম দুনিয়ার প্রলেতারিয় বিপ্লবের সংকেত হয়.... যাতে উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হতে পারে — তবে রাশিয়ার জমিতে বর্তমান যৌথ মালিকানা কমিউনিস্ট বিকাশের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কাজ করতে পারে।"

দ্বিতীয়ত, নভেম্বর বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল রাশিয়ার সুসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী। সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এই শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে বিপ্লবী শ্রেণীতে পরিণত করেছিল। এর মধ্য দিয়ে তারা অর্জন করেছিল রুশ জনগণের বিপুল আস্থা।

তৃতীয়ত, এই সংগঠিত শ্রেমিকশ্রেণী দৃঢ় মিত্র হিসাবে পেয়েছিল কৃষক সমাজকে। এই কৃষক সমাজ নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিল যে সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারি মেনশেভিকদের দল বা 'সংবিধান গণতন্ত্রী'রা কখনই জামিদারদের সাথে সংঘর্ষ করবে না। কিন্তু ভিন্ন ধাতুতে গড়া বলশেভিকরা, এরা কৃষক সমাজের প্রকৃত মিত্র। এর মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে উঠেছিল যা বিপ্লবের সাফল্যের ক্ষেত্রে ছিল গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

চতুর্থত, রাজনৈতিক সংগ্রামে বারে বারে পরীক্ষিত ও পরিশোধিত বলশেভিক পার্টির মতো পার্টি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতা। চূড়ান্ত আক্রমণে শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা বলশেভিক পার্টির ছিল।

পঞ্চমত, প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীনই রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। তখন বিশ্বের প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে রুশ বিপ্লবে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। নভেম্বর বিপ্লবের বিজয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত সমূহের প্রথম নিখিল রুশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে কমরেড লেনিন ও কমরেড স্তালিনের প্রস্তাবক্রমে সোভিয়েত জাতিগুলি স্বেচ্ছায় এক রাষ্ট্রসঙ্ঘে সম্মিলিত হয়। এর নামকরণ হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র বা ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক (ইউ এস এস আর) প্রাথমিক পর্বে এখানে রাশিয়া, ককেশাস, ইউক্রেন, বেলারুশ এবং পরবর্তীকালে উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান। তাজিকিস্তান ইত্যাদি যুক্ত হয়। এইসব প্রজাতন্ত্র স্বেচ্ছায় ইউ এস এস আর-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। এদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারও ছিল সংবিধান স্বীকৃত।

।।দুই।।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ছিল ব্যাপক। প্রথমে জাতীয় স্তরে এর প্রভাব সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। একথা সর্বজনবিদিত যে জারশাসিত রাশিয়া ছিল একটি পশ্চাৎপদ দেশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটেনের মতো। সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। বেকারী, অনাহার, দারিদ্র্য ছিল রুশ জনগণের সঙ্গী।

এ হেন পশ্চাৎপদ একটি দেশ সমাজতন্ত্রের জিয়ন কাঠির স্পর্শে একটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথমত, জারশাসিত রাশিয়ায় কারখানাগুলি ছিল অত্যন্ত পুরানো, যন্ত্রপাতিগুলি ছিল জরাজীর্ণ। ফলে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে কলকারখানাগুলিকে আধুনিক করা ছিল অত্যন্ত জরুরী।

দ্বিতীয়ত, প্রাক্ বিপ্লব রাশিয়ার শিল্প ভিত্তি ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। ভারী শিল্প ছিল না। ফলে সমাজতান্ত্রিক সরকারের কাছে যন্ত্র নির্মাণের কারখানা গড়ে তোলা ছিল বিশেষ অগ্রাধিকার।

তৃতীয়ত, আধুনিক শিল্পায়নের প্রধান ভিত্তি হল ভারী শিল্প স্থাপন যা জারশাসিত রাশিয়ায় ছিল না। ফলে আধুনিক শিল্পায়নের প্রয়োজনে সমাজতান্ত্রিক সরকার সবথেকে জোর দেয় ভারী শিল্প স্থাপনে।

এছাড়া জারশাসিত রাশিয়ায় বহু শিল্প ছিল না — যেমন যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, মোটর, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সাজসরঞ্জাম, কৃষি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানাও ছিল না। ফলে সমাজতান্ত্রিক সরকারের কাছে এইসব কারখানা স্থাপনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দেশের শিল্পায়ন ও সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

সমাজতান্ত্রিক সরকারের এইসব সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯২৯-৩৩ সালে মহামন্দায় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশ ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়, তখন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন মন্দায় আক্রান্ত হয়ে পড়েনি, বরং সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল অনেক উন্নত। মহান নভেম্বর বিপ্লবের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের জার্মানীর ভয়াবহ আক্রমণের সামনে বীরের মত লড়াই করে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু নিজেকে রক্ষাই করেনি, সমগ্র মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপরও মহান নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব ছিল ব্যাপক। নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তীকালে এর প্রভাবে একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি গড়ে ওঠে, তেমনই অন্যদিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেখানে পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি নতুন দিশা অর্জন করে। বিশ্বের দুই জনবহুল দেশ ভারতবর্ষে ১৯২০ সালে এবং চীনে ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের একাধিক দেশে ও চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। এইভাবে গড়ে ওঠে এক সমাজতান্ত্রিক শিবির।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। এশিয়া, আফ্রিকায় তাদের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে শতাধিক দেশে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী লড়াই গতিশীল হয় এবং এর পরিণতিতে ভারতবর্ষ সহ শতাধিক দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। দেশগুলি অর্জন করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

এইসব স্বাধীন দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্নির্মাণে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভূত সাহায্য করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মঞ্চে এইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের এবং নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারতের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র, তৈল শোধনাগার কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প প্রভৃতি গড়ে তোলার প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাশ্মীর প্রশ্নে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব নেই। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদায় নিয়েছে। ফলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব কার্যত নেই। কিন্তু কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের অর্থ এই নয় যে, সমাজতন্ত্র অলীক কল্পনা বা পুঁজিবাদই মানব সভ্যতার শেষ স্তর। ঐ সব দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় সমাজতান্ত্রিক নীতির কারণে নয়, বরং সমাজতন্ত্রের নীতি থেকে বিচ্যুতির কারণেই ঘটেছে। সমাজতন্ত্র গঠনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির প্রয়োগে বিপুল বিকৃতি, সংশোধনবাদী বিচ্যুতি এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকৃতি এক্ষেত্রে প্রধান। অতীতের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলির তাত্ত্বিক মূল্যায়ণে ভুল-ত্রুটি এবং কিছু কিছু পার্টির এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের ভ্রান্ত অবস্থানের জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানকে দায়ী করা যায় না।

।। তিন।।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ও পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়কে সামনে রেখে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা নিদান হেঁকেছিল, যে পুঁজিবাদই মানব সভ্যতার শেষ স্তর, সমাজতন্ত্র নয়। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব ছিল ইতিহাসের ভ্রান্তি। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা তো 'ইতিহাসের অবসান' শীর্ষক একটি পুস্তকও রচনা করেন।

কিন্তু সোভিয়েত পতনের পর বিগত আড়াই দশকের অভিজ্ঞতা কি? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের পরিণতিতে সমাজে আয় ও সম্পদের বৈষম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অক্সফ্যাম-এর ২০১৪-এর প্রতিবেদনে (ওয়ার্কিং ফর দ্য ফিউ, ২০১৪) দেখা যাচ্ছে যে আগামী বছরের মধ্যে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি সম্পদের অধিকারী হবে বিশ্ববাসীর এক শতাংশ। উপরের দিকে অবস্থানকারী ধনপতিদের সম্পদ বৃদ্ধির হার ২০০৯ সালে ছিল ৪৪ শতাংশ, ২০১৪ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৮ শতাংশ। সংস্থাটির মতে এই হার যদি অব্যাহত থাকে তবে ২০১৬ সালে তা ৫০ শতাংশ অতিক্রম করে যাবে। বিশ্বের প্রথম ৮০ জন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণ বিশ্বের ৫০ শতাংশ মানুষের মিলিত সম্পদের সমান। গত বছরে এই সংখ্যাটি ছিল ৮৫ জন। অক্সফ্যামের এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, গতবছর বিশ্বে শতকোটি ডলারপতিদের (বিলিওনিয়ার) তালিকায় ২১০ জন যুক্ত হয়েছে। এর পূর্বে এই সংখ্যা ছিল ১৪২৬ জন। এদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৫৬৪ ট্রিলিয়ন (৫৬৪ লক্ষ কোটি) ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক শতাংশ ধনী মানুষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দেশের ৪০ শতাংশ সম্পদ। বিশ্বব্যাপী আয় ও সম্পদের বৈষম্যের মাপকাঠিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে উচ্চ আয়ের অঞ্চলগুলিতে বৈষম্যের এই তালিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান তিন নম্বরে রয়েছে। এর উপরে রয়েছে সিঙ্গাপুর এবং হংকং। মার্কিন মুলুকে এই বৈষম্যের হার ইউরোপের যেকোনো দেশের তুলনায় বেশি।

ভারতেও গত দশ বছরে শতকোটি ডলারপতির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই সংখ্যা ছয় থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে একশো। অপরদিকে ভারতে অধিকাংশ লোক পেট পুরে খেতে পায় না। আট ভাগের এক ভাগ মানুষ চরম ক্ষুধার্ত। ৪৮ শতাংশ শিশুই অপুষ্টির শিকার।

বর্তমানে বিশ্ব পুঁজিবাদ এক গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত। ২০০৭-০৮ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয়েছে, তার অবসানের কোনো লক্ষণ নেই। পরন্তু এই সঙ্কটের প্রভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এর প্রতিফলন রাজনৈতিক অঙ্গিনাতেও পড়েছে। গ্রীসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এর বড় প্রমাণ। পুঁজিবাদের বর্তমান স্তরের সঙ্কটের তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, বর্তমান সঙ্কট দীর্ঘস্থায়ী। অতীতের সঙ্কটগুলি কখনই এতটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটের কারণে 'বেইল আউট' প্যাকেজের মধ্য দিয়ে আর এই সঙ্কট সমাধান করা যায় না, ফলে ব্যয় সংঙ্কোচন নীতি গৃহীত হচ্ছে। তৃতীয়ত, পূর্বে ধনতন্ত্রের পরিধিতে অবস্থিত দেশগুলি আক্রান্ত হত। এখন আক্রান্ত হচ্ছে ধনতন্ত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত দেশগুলিই।

পুঁজিবাদ তার সৃষ্ট সঙ্কটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চাইছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে জনগণের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ইউরোপের ব্যয় সঙ্কোচন নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

বেতন কমিশন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থের কথা কে বা কারা বলবেন, বা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন তা সম্পূর্ণতই অনিশ্চিত। কিন্তু সংসদের বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা ইতোমধ্যেই তাঁদের সংগঠনের মাধ্যমে অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। গত বেতন কমিশনের ন্যায় 'বুস্টিং'-এর দাবি তাঁরা উত্থাপন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের দাবি না মানা পর্যন্ত বিক্ষোভ-কর্মসূচী জারি থাকবে বলেও তাঁরা জানিয়েছেন। এখন দেখার 'আচ্ছে দিনের' ফেরিওয়ালারা কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি সম্পর্কে কতটা সহানুভূতিশীল।

শুধু বেতনক্রমেই যে আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়নি, তা নয়। আরও বেশ কিছু সুপারিশ রয়েছে যা কর্মচারীদের খুশি করতে পারেনি, এমনকি একাংশের সুপারিশ কর্মচারীর স্বার্থের বিরুদ্ধেও করা হয়েছে। যেমন বাড়ি ভাড়া ভাতা ১০-২০-৩০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে যথাক্রমে ৮-১৬-২৪ শতাংশ করার সুপারিশ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের প্রাপ্য বিভিন্ন ভাতার সংখ্যাও এক ধাক্কায় অনেকখানি কমিয়ে দেওয়ার কথা কমিশন বলেছে। কিন্তু সব থেকে বিপজ্জনক বিষয় হল, ডাক বিভাগে কর্মরত ই ডি (একস্ট্রা ডিপার্টমেন্টাল) কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতেই কমিশন নারাজ। তাই তাঁদের সম্পর্কে কোনো সুপারিশই করা হয়নি। এটি বেতন কমিশনের সদস্যবৃন্দের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো সিদ্ধান্ত শুধু নয়, পক্ষান্তরে নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন। তাই এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের লড়াইয়ের পাশে সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের সংহতি প্রদর্শন প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন কাজ শুরু করলেই, রাজ্যে রাজ্যে কর্মচারীদের জন্য অনুরূপ প্রক্রিয়া শুরু হয়। কারণ নির্দিষ্ট ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচকের ভিত্তিতে বেতন কাঠামো ও ভাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত পদ্ধতিকে আদর্শ উদাহরণ হিসেবে রাজ্য সরকারগুলি অনুসরণ করে। ফলে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের কাজ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত, রাজ্যস্তরে গঠিত বেতন কমিশনগুলির সুপারিশ চূড়ান্ত করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু প্রস্তুতি বা প্রক্রিয়া শুরু হয় আগেই। এবারেও অন্যান্য রাজ্যে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হলেও, ব্যতিক্রম ছিল পশ্চিমবঙ্গ। প্রায় দু'বছর ধরে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের কাজ চলছে, অথচ রাজ্য সরকারের কোনো হেলদোল ছিল না। বিজ্ঞপ্তি জারির মতো প্রাথমিক কাজটুকুও করা হয়নি। এমনকি বেতন কমিশন যেহেতু গঠন করা আবশ্যিক, তাই দ্রুত বকেয়া মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতনের সাথে সাধারণ সমতা বিধানের কাজটাও করার কথা ভাবা হয়নি। এক কথায় বেতন কমিশন বা মহার্ঘভাতা সম্পর্কে রাজ্য সরকার ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। রাজ্য সরকারের উদাসীনতা যত দীর্ঘায়িত হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মচারীদের ক্ষোভও। এই ক্ষোভকেই বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ভাষা দিয়েছে কর্মচারীদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী বৃহত্তম সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। ২০১৪-র ফেব্রুয়ারিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বেতন কমিশন গঠনের অনুরোধ জানানো হয়। যথারীতি জবাব পাওয়া যায় নি। ঐ বছরেরই ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতা ও শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত দুটি বিশাল কর্মচারী সমাবেশ থেকে যে স্মারকলিপি সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়, তাতেও বেতন কমিশন গঠনের দাবি ছিল। ঐদিনই মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার চেয়ে সংগঠনের নেতৃত্ব 'নবান্নে' প্রবেশ করলে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রী নেতৃত্বের সাথে আলোচনায় বসেন। সেখানেও বেতন কমিশনের দাবি জোরালোভাবে জানানো হয়। ২০১৫-র জুন মাসে তিনদিন একেবারে ব্লক স্তর পর্যন্ত সংগঠনের কর্মী ও সদস্যবন্ধুরা বডি পোস্টার পরিধান করে দপ্তরে কাজ করেছিলেন। ঐ বডি পোস্টারেও অন্যতম দাবি ছিল বেতন কমিশন। সর্বোপরি ২ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ধর্মঘটের দিনে এরাজ্যে রাজ্য সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ৩৫টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ নিজস্ব ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে যে ধর্মঘট করে, তারও অন্যতম দাবি ছিল বেতন কমিশন গঠন। এছাড়াও গত দু'বছরে (২০১৪-১৫) অনুষ্ঠিত অসংখ্য বিক্ষোভসভা, হলসভা, মিছিল, সমাবেশ প্রভৃতি সমস্ত ধরনের কর্মসূচীতেই বেতন কমিশন গঠনের দাবি উচ্চারিত হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠন এই সময়কালে যে সমস্ত আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচী প্রতিপালন করেছে তাতেও অন্যান্য দাবির সাথে স্থান পেয়েছে বেতন কমিশনের দাবি। ধারাবাহিক এই সাংগঠনিক উদ্যোগ রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তড়িঘড়ি তাঁর অনুগত কর্মচারীদের নিয়ে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি সভা ডাকেন। সেই দলীয় সভায় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় কল্পতরু হতে গিয়ে বেশ কিছু ঘোষণা করেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দলীয় সভা ও প্রশাসনিক সভার পার্থক্যের ধার কোনোদিনই ধারেন না। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর কল্পতরু ঘোষণার অন্যতম ঘোষণা ছিল 'অক্টোবর মাসেই বেতন কমিশন বসানো হবে।' সেদিনই সংগঠন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, শুধু ঘোষণা করেই বেতন কমিশন গঠন করা যায় না। এর নির্দিষ্ট কিছু প্রশাসনিক পদ্ধতি রয়েছে, যা সম্পূর্ণ না হলে এই ঘোষণা অর্থহীন। সংগঠনের প্রতিক্রিয়া যথার্থ প্রমাণিত হল, যখন দেখা গেল অক্টোবর গড়িয়ে গেলেও বেতন কমিশন গঠন শুধু ঘোষণাই রয়ে গেল।

এই সময়েই ১৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় পে-কমিশন তাঁদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেয়। ফলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও কালবিলম্ব না করে, ২১-২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ২৩ নভেম্বর পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র প্রেরণ করে। সেখানে অক্টোবর মাসে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তিনি যে ঘোষণা করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দ্রুত বেতন কমিশন গঠনের অনুরোধ জানানো হয়। ২৪ নভেম্বর রাজ্যের ব্লক স্তর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ সভা। কাউন্সিল থেকেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, আগামী ১-২ ডিসেম্বর দপ্তরে দপ্তরে পাঁচদফা দাবি সংবলিত ব্যাজ পরিধান করা হবে এবং টিফিনে অনুষ্ঠিত হবে অবস্থান বিক্ষোভ। এই সামগ্রিক পরিমণ্ডলই কার্যত রাজ্য সরকারকে অবশেষে বাধ্য করে ২৭ নভেম্বর বেতন কমিশন গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করতে। আট সদস্য বিশিষ্ট বেতন কমিশনের মাথায় রয়েছেন অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার। টার্মস অফ রেফারেন্সটি হুবহু ৫ম বেতন কমিশনের অনুরূপ। বেতন কমিশনে কর্মচারীদের প্রতিনিধি রাখাটা অনুসৃত প্রথা। কিন্তু এই বেতন কমিশনে যাঁকে কর্মচারী প্রতিনিধি হিসেবে রাখা হয়েছে, তিনি এক সময়ের কর্মচারী (মৃগেন মাইতি) বর্তমানে শাসক দলের এম এল এ। গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারের অভাব ঘটলে যা হয় আর কি!

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ যৌথমঞ্চের শরিক সংগঠনগুলির ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপই যে বেতন কমিশন সংক্রান্ত টালবাহানার অবসান ঘটিয়েছে তা বলা বাহুল্য। শুধু বেতন কমিশনই নয়, এ পর্যন্ত যতটুকু মহার্ঘভাতা (আগামী জানুয়ারিতে প্রাপ্য ১০ শতাংশ সহ) পাওয়া গেছে, তাও আদায় করতে হয়েছে রাস্তায় নেমেই।

বেতন কমিশন গঠনের প্রাথমিক প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলেও, বেশ কিছু বিষয় এখনও রয়েছে যা নজর-আন্দাজ করা যাবে না। যেমন বকেয়া মহার্ঘভাতার কী হবে? দ্বিতীয়ত, পঞ্চম বেতন কমিশনের ২য় ও ৩য় অংশের সুপারিশগুলিরই বা কী হবে?

পূর্বতন বেতন কমিশনের সুপারিশকে অকার্যকরী রেখে, পরবর্তী বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রস্তুত করা অবৈজ্ঞানিক এবং প্রশাসনিক ন্যায়-এর পরিপন্থী। তাই এই বিষয়ে দ্রুত ফয়সালা করা প্রয়োজন বলেই সংগঠন মনে করে। সর্বোপরি ধার্য সময়সীমা (ছ'মাস) -র মধ্যেই বেতন কমিশনের কাজ সম্পূর্ণ করার দাবিও সংগঠনের এজেন্ডায় অগ্রাধিকার পাবে। স্মরণে রাখা দরকার গত পঞ্চম বেতন কমিশনের প্রথম অংশের সুপারিশ কার্যকরী হয়েছিল ছ'মাসের মধ্যেই। বেতন কমিশনের কাছে কর্মচারী স্বার্থে সর্বোৎকৃষ্ট সুপারিশ জমা দেবার যে ট্র্যাডিশন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রয়েছে, এবারেও তার অন্যথা হবে না। এ সংক্রান্ত চর্চা ও প্রস্তুতির কাজ শুরুও হয়ে গেছে। কর্মচারী স্বার্থে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ছিল, আছে ও থাকবে। □

সুমিত ভট্টাচার্য

প্রকৃতিই ভরসা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

ম্যালেরিয়ার পর্যায়ে চলে এসেছিল। হালকা থেকে অতিমাত্রার জ্বর, সেই সঙ্গে হাত ও পায়ে ব্যথা— এই ছিল ডেঙ্গুর প্রাথমিক লক্ষণ। কমবেশী ৫ দিন ভোগার পর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জ্বর কমে যেত। সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গু না ম্যালেরিয়া তা নিয়ে চিন্তা করতে হতো না। চিকিৎসকরাও প্রথমবার ডেঙ্গুকে অতটা ভয়াবহ বলে মনে করতেন না। কিন্তু এবার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। এখন একবার ডেঙ্গুতেই অনুচক্রিকার মাত্রা ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে, ফলে হাসপাতালে ভর্তি ছাড়া উপায় নেই। আবার একটু সেরে উঠলেই হাসপাতাল আর রোগীকে রাখতে চাইছে না। কিন্তু জ্বর কাটিয়ে বাড়িতে ফিরতেই রোগীর নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। আবারও প্লেটলেট কমে যাচ্ছে বা গায়ে লালচে দাগ দেখা দিচ্ছে, অভ্যন্তরীণ রক্ত ক্ষরণের ইঙ্গিত। একে হেমারেজিক ডেঙ্গু আখ্যা দেওয়া হয়, এবং এটা বিপদজনক।

সরকারী হাসপাতালে পরিকাঠামোর ভীষণ অভাব। ধুম জ্বর নিয়ে আসা রোগী কি ধরনের জ্বরে আক্রান্ত তা বুঝতেই তিনদিন পার হয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালে NS1 পরীক্ষার তেমন ব্যবস্থা নেই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্লেটলেট কাউন্ট থেকে অনুমান করেই চিকিৎসা চালাতে হচ্ছে। ডেঙ্গুতে রক্ত জমাট বাধার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়, তাই একটু ফ্লুইড প্রয়োগ করতে পারলে আক্রান্তকে বিপদমুক্ত করা যায়। বর্তমানে যে ভাইরাসটি বেশী সক্রিয় তা মানুষের লিভারে আক্রমণ করছে ফলে প্লেটলেটের সঙ্গে রক্তের শ্বেতকণিকা কমে যাচ্ছে। শরীরের মূল প্রতিরোধ শক্তির উৎস শ্বেতকণিকা — অন্যান্য রোগ সংক্রামিত হয়ে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তা ডেঙ্গু রোগে মৃত্যু বলে নির্ধারিত হচ্ছে না।

কলকাতা পৌরসভা সহ রাজ্যের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ভূমিকা মোটেই ভাল নয়। পঞ্চায়েতগুলির অবস্থাও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ভীষণ করুণ। কলকাতা পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ জনসচেতনতা বৃদ্ধির পক্ষে পুস্তিকা প্রকাশ করেছে, লিফলেট, হোর্ডিং ও পোস্টার লাগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। পুস্তিকাতে কলকাতার ১৪০টি ম্যালেরিয়া ও ৫টি ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রের ঠিকানা দেওয়া আছে। কিন্তু NS1 পজিটিভ রিপোর্ট হাতে নিয়েও সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছেনা আক্রান্ত রোগী। পুস্তিকাতে বলা আছে কলকাতা পৌর অঞ্চলে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর খবর পেলে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তার বাসস্থান ও সংলগ্ন ৫০টি বাড়ি পরিধিকে কেন্দ্র করে মশার কামান চালাবে পৌরসভা। কিন্তু ডেঙ্গুর এতটা সংক্রমণ সত্ত্বেও সে কামান চোখে পড়ছে না তেমন ভাবে। এই মশা দিনে কামড়ায়— কিছুটা মশার ঔষধ প্রয়োগ হচ্ছে ঠিকই তবে তা এই পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত নয়। সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ পাচ্ছে যখন আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে প্রশাসক ও শাসক দলের নেতাদের বক্তব্যের চাপান-উতোর চলছে। যে করে হোক সংখ্যাটা কমিয়ে দেখাতে হবে— এটাই টার্গেট। সরকারী হাসপাতালগুলিতে ডেঙ্গু ভাইরাস নির্ণয় করার প্রকৃত পরিকাঠামো গড়ে তোলা বিশেষ জরুরী— যা মোটেই গুরুত্ব পাচ্ছে না। ব্যয় সাপেক্ষ বেসরকারী ব্যবস্থার উপরেই নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েতগুলিকে মশা নিয়ন্ত্রণে আরও সক্রিয় করে তোলার পরিবর্তে — বড় বড় ফ্লেক্স ও হোর্ডিং-এ সাফল্যের পরিসংখ্যান জ্বল জ্বল করছে।

মূলত আগস্ট, সেপ্টেম্বর মাস অবধি ডেঙ্গুর প্রকোপ থাকে— কিন্তু এ বছর অক্টোবর, নভেম্বরের মাঝামাঝি অবধি এর প্রকোপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঠান্ডা দেরিতে আসার জন্যই ডেঙ্গুর প্রকোপ থকে যাচ্ছে এবং মশার লার্ভার প্রজনন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। সরকারের উপর আস্থা রেখে বাঁচার উপায় দেখা যাচ্ছে না, তাই প্রকৃতিই ভরসা। শীত পড়তে শুরু করেছে, প্রকৃতির তাপমাত্রা ১৬° সেলসিয়াসে নেমে আসলেই ডেঙ্গুর ভাইরাস মরে যায়। আমরা সেই আপেক্ষাতেই থাকলাম, আর কত জনকে আক্রান্ত করে বাংলায় শীত আসবে— তবেই এ বছরের মত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে বাংলার মানুষ! রাজ্য সরকারের অপদার্থতার ফলে এ ছাড়া আর করার কিই বা আছে? □

সুগত দাস

জাঠার জয়যাত্রা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

মিথ্যাচার। রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন, নেই শিল্প-কর্মসংস্থান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নৈরাজ্য, সরকারের নীতি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেই আক্রমণের আশঙ্কা, মিছিল-ধর্মঘট করা যাবে না। প্রশাসনিক নানা কায়দায় আক্রমণ নিদেনপক্ষে দূরান্তরে বদলির নিদান। মহিলাদের নিরাপত্তা চূড়ান্তভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে সারা রাজ্যে। আক্রান্ত হচ্ছে গণমাধ্যমও। মেলা, উৎসবের নামে যথেচ্ছ খরচ — বিজ্ঞাপনী প্রচার — ক্লাবগুলোকে ঢালাও খয়রাতি রাজ্যকে ঋণ জর্জরিত করে তুলেছে। বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছরে বাজার থেকে ধার করেছিল ৭২ হাজার কোটি টাকা আর এখনকার সরকার ৩১ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত ৪৬ মাসে ধার করেছে ৮৫ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা।

কিন্তু পরিকল্পিতভাবেই মেটানো হচ্ছে না রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন পান এমন শ্রমিক - কর্মচারী-শিক্ষকদের বকেয়া ডিএ। কেন্দ্রীয় পে-কমিশন সুপারিশ পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর আমাদের রাজ্যে পে-কমিশন নিয়ে সরকারের কোন হেলদোলই নেই। প্রতিটি বিভাগে অসংখ্য পদ শূন্য। কিন্তু নিয়োগ নেই। কোন বিভাগে কিছু অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পুনর্নিয়োগ করে কোথাও বা সামান্য কিছু সংখ্যক ঠিকাচুক্তিতে নিয়োগ করে দায়সারা প্রশাসন চলছে। রাজ্যে নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, কেলেঙ্কারির ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলনের পথে যাওয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই। যতক্ষণ এই অবস্থার পরিবর্তন না ঘটছে ততক্ষণ তীব্র লড়াই-আন্দোলনের পথেই থাকতে হবে সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী মানুষদের। এই জাঠা সেই লড়াইয়ের দ্যোতক। এত বাধা-বিপত্তি-আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে এই জাঠার সংগ্রামী সাফল্য লড়াইয়ের ময়দানে নিঃসন্দেহে এক 'মাইলস্টোন' হিসাবে থাকছে— যা নিরন্তর সংগ্রামী অনুপ্রেরণা যোগাবে। □

পরমেশ দে

বিহার নির্বাচন

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

গত ৮ নভেম্বর এই সমস্ত ঝড় সামাল দিয়ে, সমস্ত সমীক্ষাকে উড়িয়ে দিয়ে বাজিমাত করলো মহাজোট। রাজ্য বিধানসভায় মোট ২৪৩ টি আসনে বিজেপি-র ঝুলিতে এসেছে মাত্র ৫৩টি আসন, সব মিলিয়ে এন ডি এ-৫৮টি আসন, এবং মহাজোটের ঝুলিতে এসেছে মোট ১৭৮টি আসন। আর জে ডি-৮০, জে ডি (ইউ)-৭১, কংগ্রেস-২৭ এবং অন্যান্যরা পেয়েছে ৭টি আসন।

সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে মহাজোটের জোরদার এই লড়াই এবং জয় সমগ্র দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিল যে — মোদী আফিং 'আচ্ছে দিন' আনার জন্য উপযুক্ত নয়, মানুষই একমাত্র আনতে পারে 'আচ্ছে দিন'। অর্থাৎ মানুষের অভিজ্ঞতাই শেষ কথা বলে। এই জয় সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য — দেশ ও রাজ্যে 'নমো আফিং' ও 'মম আফিং'-এর মধ্যে কিছু ফারাক নেই। একজন অড়হড় ডাল, পেট্রোল, ডিজেল আর গ্যাসের দাম বাড়িয়ে চলেন, সাথে সাথে বিদেশী পুঁজির দরজা হাট করে খুলে দেন। আর একজন টাস্ক ফোর্স গঠন করে বাজার ঘুরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম চড়িয়ে দেন। দু'জনেই বক্তৃতায় বলে চলেন দেশ ও রাজ্য তরতর করে এগিয়ে চলেছে। দেশের ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। আসলে সবই ফাঁকা। ঘটে চলেছে মূল্যবৃদ্ধি। আবার 'নমো ও মম' সমঝোতা যে খুব ভালো ভাবেই চলছে তা বোঝা যায় বাংলার চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্ত প্রক্রিয়াকে যেভাবে ঢিমেতালে করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, তাতে। শেষে বলা যায় বিহারী বনাম বাহারি ঝড়ে যেমন নমো আফিং এর ঘোর কেটেছে তেমনই বাংলায় মম আফিং এর ঘোরও কাটতে চলেছে, যার পথ দেখিয়েছে শিলিগুড়িতে মহকুমা পরিষদ ও পৌর নির্বাচনের ফল। এ লড়াইটাও কিন্তু সহজ নয়। বর্তমান সরকার তথা নেত্রীর অতীতে দেওয়া সমস্ত পুরনো প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতা বারংবার জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তবেই আবার এ রাজ্যেও সুদিন আসবে। □

কুমকুম মিত্র।

নভেম্বর বিপ্লব

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

পাশাপাশি ল্যাটিন আমেরিকার ডজনখানেক দেশের সরকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও নব্য উদারনীতির বিরুদ্ধে বিকল্প নীতি নির্মাণ করেছে।

ভারতবর্ষে বিগত আড়াই দশক ধরে নব্য উদারনীতির প্রয়োগের ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ছে। বিগত ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের পর নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নব্য উদারনীতির প্রয়োগ অর্জন করেছে এক নতুন মাত্রা। এর পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদীদের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নীতি দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে আক্রান্ত করে চলেছে। এরই সূত্র ধরে গণতন্ত্রের বিপদও বাড়ছে।

এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। বিগত ২ সেপ্টেম্বর ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী-শিক্ষকদের অর্ধ-শতাধিক ফেডারেশনের ডাকে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে।

বিগত চার বছরের বেশি সময় ধরে এই রাজ্যে চলতে থাকা তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার, জীবন ও জীবিকা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। শিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে ব্যাপক নৈরাজ্য। নারীদের নিরাপত্তা নজিরবিহীনভাবে বিপন্ন। রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, বোর্ড-কর্পোরেশন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া বিপন্ন। ৫৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বকেয়া, প্রশাসনিক সন্ত্রাসে কর্মচারী-শিক্ষক সমাজ আক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াই, জাতীয় স্তরে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি রক্ষার সংগ্রাম এবং রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইগুলিতে নভেম্বর বিপ্লবের মহান আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছে। মহান নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ। □

রাজ্য কাউন্সিল সভা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমিতিগুলির নিজস্ব দাবি-দাওয়া ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণে দ্রুত উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। বিগত কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩২টি সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে সভা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে নবীকরণ সহ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রকে সঠিকভাবে ব্যবহারের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে ঘাটতি রয়েছে। যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তাকে প্রতিপালনের প্রশ্নে আরও পরিচর্যা প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রশ্নে চেতনার বিকাশ ও সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি ঘটানোর লক্ষ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। যে সমস্ত নবীন প্রজন্মের কর্মচারীরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের যুক্ত করে কর্মী তালিকা তৈরি, উপযুক্ত নার্সিং এর মধ্য দিয়ে আগামীদিনে তাদের কর্মী-নেতৃত্বে উন্নীত করতে হবে। পেশাদারী মানসিকতা এবং সাহস ও আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে আগামীর সংগ্রাম আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যার মধ্য দিয়ে নতুন পরিস্থিতি উপযোগী সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে।

আগামী আন্দোলন কর্মসূচী আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি বলেন, আগামী ২৩ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পুনরায় চিঠি দেওয়া হবে কর্মীদের যাবতীয় বকেয়া মিটিয়ে অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে। আগামী ২৪ নভেম্বর মঙ্গলবার টিফিনের সময় সমস্ত সরকারী অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী পালন করা হবে। এছাড়াও ডিসেম্বর মাসের ১ ও ২ তারিখ দপ্তরে দপ্তরে দাবি সংবলিত ব্যাজ পরিধান ও টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ সভা করবেন কর্মচারীরা তাদের অনাদায়ী দাবি আদায়ের লক্ষ্যে।

দাবিগুলি হল ● অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করো। ● বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান সহ পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ দ্রুততার সঙ্গে কার্যকর কর। ● চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদেরও নতুন বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত করো। ● নীতিহীন ও হয়রানিমূলক বদলি বন্ধ করো। ● ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সুনিশ্চিত করো এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখ।

এর পরবর্তীতে ২৯ ডিসেম্বর জেলায় জেলায় এবং কলকাতার ৭টি অঞ্চলে অফিস ছুটির পর কর্মচারী জমায়েতের কর্মসূচী হবে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে কলকাতায় কেন্দ্রীয় জমায়েতের কর্মসূচী প্রতিপালন করা হবে। ''আক্রান্ত আমরা'' সংগঠনের আহ্বানে ১০ ডিসেম্বর '১৫ বিশ্ব-মানবাধিকার দিবসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ৩০ ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচীতে আমাদের সংগঠনকে যোগদান এবং তাদের প্রতি সংহতি জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। আমরা আগামী ১০ ডিসেম্বর অফিস ছুটির পর কেন্দ্রীয় ভাবে মিছিল করে এই কর্মসূচীতে যোগ দেব। এক্ষেত্রে কলকাতার ৭টি অঞ্চল ছাড়াও দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী জেলা যুক্ত হবে। এছাড়াও সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে মহিলা কনভেনশন হবে আগামী ২৩-২৪ জানুয়ারি ২০১৬ তেলেঙ্গানার ওয়ারঙ্গলে। ২৫ জন মহিলা প্রতিনিধি আমাদের রাজ্য থেকে সেখানে যাবেন। ১২টি অন্তর্ভুক্ত সমিতি, একটি সহযোগী সমিতি ও পঞ্চায়েত যৌথকমিটির অন্তর্ভুক্ত ৫টি সমিতির রাজ্য সম্মেলন আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনগুলি সফল করার লক্ষ্যে অবিলম্বে সাংগঠনিক তৎপরতা গ্রহণ করতে হবে।

রাজ্যজুড়ে যে ভয়ঙ্কর

কাউন্সিল সভার একাংশ

পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ভোট প্রক্রিয়া, সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মত প্রকাশের সুযোগ আজ আক্রান্ত, প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সুযোগ আজ আক্রান্ত। সমাজের অংশ হিসাবে আইনের মধ্যে থেকেই আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে। গোটা দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি/সাংসদ/মন্ত্রীরা জেল খাটলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিগত দিনে এ ঘটনা ছিল না কিন্তু সারদা কেলেঙ্কারির জেরে রাজ্যের একজন মন্ত্রী জেল খাটছেন এ ঘটনাও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমরা মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের পরিবারকে উৎসাহিত করি না, এটাকে অবিলম্বে গুরুত্ব দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে আমাদের সর্বাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আজ পুলিশ কর্মীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন, রক্তাক্ত হচ্ছেন, খুন হচ্ছেন। পরিবর্তনের পরপরই পুলিশের সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা গণতন্ত্রকেই আক্রমণের শামিল ছিল।

দেশের ক্ষেত্রেও আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকারের আমলে, মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর সরাসরি আক্রমণ ঘটছে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৪-র গোটা দেশের ক্ষেত্রে শিখ নিধন সত্ত্বেও বামপন্থীদের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা এ রাজ্যকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছিল। ১৯৯২-এর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরবর্তীতে এ রাজ্য সাম্প্রদায়িক হানাহানি থেকে রক্ষা পেয়েছিল তৎকালীন প্রশাসনিক ও বামপন্থীদের ভূমিকার কারণে। এ রাজ্যের ঐতিহ্য জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যের যে নজির ছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজ সেই ঐক্যে ফাটল ধরানোর, ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টা চলছে। রাজ্যের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, নিজ পরিবারের স্বার্থে, সর্বোপরি আগামী প্রজন্মের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং রাজ্যের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান সাধারণ সম্পাদক।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার পরবর্তীতে ১৯টি জেলা, কলকাতার ৭টি অঞ্চল, ৩২টি সমিতি এবং ৫টি সহযোগী সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়। বক্তারা তাঁদের আলোচনায় রাজ্যজুড়ে গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ, ধর্মঘটের পর্যালোচনা, সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে কাউন্সিলের মূল্যায়ণ এবং আগামী করণীয় বিষয়ে সংগঠনকে আরও নিবিড় করার প্রশ্নে তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন।

সমস্ত আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য। শুরুতেই বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা সহ আগামী কর্মসূচী, ধর্মঘটের পর্যালোচনা এবং সংগঠনের চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রশ্নে যে বক্তব্য রাজ্য কাউন্সিলে উঠে এসেছে তাকে সাধুবাদ জানান। সমিতিগুলির ক্ষেত্রে নিজস্ব দাবি দাওয়ার প্রশ্নে কর্মসূচী গ্রহণের যে বিষয়ে সামনে এসেছে তাকে সার্থকভাবে প্রতিপালনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। ক্যাশলেস হেলথ স্কীম বিষয়ে যে সমস্ত সমস্যার কথা আলোচনায় উঠে এসেছে সে বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে এ সমস্ত অসংগতির বিষয়ে পূর্বাহ্নেই প্রশাসনের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কিন্তু কোনো পদক্ষেপ প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্বকে বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হবে যে এই সরকার শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থে কোনো কাজ করতে পারে না। কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সমস্ত আদেশনামা বিষয়ে মুখপত্রগুলিতে প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে, ধর্মঘট সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্যাট-এ যে কেস চলছে তার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা করা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে, যা এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সমার্থক। ত্রৈমাসিক রিপোর্ট সহ বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদানে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। সকল সদস্য বন্ধুর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন বিগতদিনে যা বৈশিষ্ট্য ছিল। সমিতির অ্যাচিভমেন্টস নিয়ে আলোচনা, সমিতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে নবীন প্রজন্মের কর্মচারীরা বুঝতে পারে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আমাদের সংগঠনের পার্থক্য কোথায়। সকল কর্মচারী সদস্য বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিবিড় যোগাযোগ করে সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে দৃঢ় ঐক্য গড়ে এগোতে হবে। মধ্যবিত্তের ওপর উদার অর্থনীতির প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এটাও সত্য যে, ধর্মঘট অনিবার্য ছিল এ বার্তা আমরা সব কর্মচারীর কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি।

ইউনিট কমিটিগুলির সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগ গড়ে তুলে, সৎ-সাহসী মনোভাব নিয়ে সঠিক ভূমিকা গ্রহণ, সঠিক কর্মী চয়ন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন সংগ্রামে শামিল হয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনে ব্রতী হতে হবে। To Achieve Something, Change the Situation এটাই হোক এই কাউন্সিলের আহ্বান। সম্পাদকের প্রস্তাবনা, বক্তাদের আলোচনা এবং যুগ্ম সম্পাদকের জবাবী বক্তব্য ও আগামী করণীয়কে কাউন্সিল সদস্যদের দ্বারা গ্রহণের পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অশোক পাত্র সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

দেবাশীষ রায়, শাশ্বতী মজুমদার

বি জি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, ৫ম বেতন কমিশনের ২য় ও ৩য় অংশের সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করা এবং বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদানসহ ৫ দফা দাবিতে বি জি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে রাজ্য ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ২৭ নভেম্বর ২০১৫ টিফিন বিরতির সময় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসের অভ্যন্তরে শাসকদলের অনুগামী কর্মচারীদের তীব্র সন্ত্রাসের পরিমণ্ডলকে উপেক্ষা করেই শতাধিক কর্মচারী অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। সভা করার নির্দিষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও শাসকদলের নির্দেশে প্রশাসনিক অনুমোদন না পাওয়ায় কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে প্রেসের অভ্যন্তরে উন্মুক্ত স্থানে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভা পরিচালনা করেন সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের সভাপতি সন্দীপ বিশ্বাস। সভার শুরুতেই বি জি প্রেস আলিপুর ইউনিটের সম্পাদক বাবলু ঘোষ সমিতির সাংগঠনিক কর্মসূচী সমূহ ব্যাখ্যা করেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমিত ব্যানার্জী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বর্তমান রাজ্য সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে ৫ম বেতন কমিশনের ২য় ও ৩য় অংশের কর্মচারীদের স্বার্থবাহী সুপারিশসমূহ কার্যকরী করা, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন অবিলম্বে গঠন করা এবং বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা সহ সর্বশেষ উত্থাপিত ৫ দফা দাবি আমরা অবশ্যই আদায় করতে সক্ষম হবো। একই সঙ্গে সমিতির ২৩তম রাজ্য সম্মেলনকে সাহসিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য কর্মচারীদের নিকট আহ্বান জানান। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের সম্পাদক সুব্রত গুহ ৬ষ্ঠ রাজ্য কাউন্সিলের গৃহীত কর্মসূচী সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করেন।

বেতন কমিশনের দাবিতে বি জি প্রেসে বিক্ষোভরত কর্মচারীরা

সভায় সভাপতি সন্দীপ বিশ্বাস সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন আক্রমণ করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতি সমূহের কর্মচারীদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যাবে না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ সংগঠন যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। অর্জিত অধিকারসমূহ রক্ষা এবং কর্মচারী স্বার্থে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন অবশ্যই আমাদের করতে হবে। □

রাজ্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৪ নভেম্বর গোটা রাজ্য জুড়ে ব্লকস্তর পর্যন্ত বেতন কমিশন গঠন, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান সহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন হাজার হাজার কর্মচারী। পাশের ছবিটি নবমহাকরণ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভার। এই সভায় বক্তব্য রাখেন অঞ্চল সম্পাদক শুকদেব সীট।

আক্রান্তের পাশে এক সংগ্রামী সহমর্মী

বিগত ২ সেপ্টেম্বর '১৫ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের দিন ধর্মঘট সমর্থনকারীদের উপর শাসকবাহিনীর উন্মত্ত আক্রমণের ভয়াবহ চিত্র টেলিভিশনে দেখে শুধু রাজ্যবাসী নয়, গোটা দেশ তথা বিশ্ব শিহরিত হয়েছে। নানা আক্রমণের ঘটনার মধ্যে একটি মর্মান্তিক দৃশ্য আজও আমরা ভুলতে পারি নি। বহরমপুরে ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগার কর্মচারী কিঙ্কর দাসের উপর তৃণমূলীদের বর্বর আচরণের দৃশ্য দেখে সেদিন সবার হৃদয় কম্পিত হয়েছিল। তিন-চার জন শাসকবাহিনী গুণ্ডা লাঠি, বাঁশ দিয়ে কিঙ্কর দাসকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মেরেছিল সেদিন। কিঙ্কর দাস আজও সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারেননি। ঐ নারকীয় আক্রমণের পরও শাসকের রোষ কমে নি। কিঙ্করকে বদলী করা হয়েছে সুদূর খরজুনায়।

অনেকের মতোই সেদিন টেলিভিশনে সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছিলেন সুদূর কোচবিহার জেলার অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, পেনশনার্স সমিতির সদস্য উমেশ চন্দ্র ঘোষ। আক্রান্ত কিঙ্করের পাশে সহযোদ্ধার মতো দাঁড়াতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কোচবিহার জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে

আক্রান্তের কাছে সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলার নেতৃবৃন্দ

মুর্শিদাবাদ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাছে কিঙ্করের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দেড় হাজার টাকার একটি চেক তিনি পাঠিয়ে দেন। বিগত ২৫ অক্টোবর বহরমপুরে কিঙ্করের বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ চেকটি তুলে দেন। কিঙ্কর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উমেশবাবুকে ধন্যবাদ জানান। এই উদ্দেশ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে কিঙ্করের বাড়িতে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক আশীষ বাগচী, যুগ্ম সম্পাদক বীরেন রায়, সভাপতি বীরেন মণ্ডল, পেনশনার্স সমিতির জেলা সম্পাদক সুভাষ সরকার এবং জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক দুলাল দত্ত।

উমেশচন্দ্র দাসের এই সহমর্মিতার উদ্যোগকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 7th Issue, November 2015

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

রক্তস্নাত প্যারিস মনে করালো মুম্বই হামলাকে

বছরের শুরুতে শার্লি এবদোঁর পর ফের রক্তাক্ত প্যারিস। সেই প্যারিস, জ্ঞানদীপ্তির প্যারিস, ফরাসী বিপ্লবের প্যারিস, কমিউনের প্যারিস, যে শহরের লক্ষ্যই হল সুন্দর হওয়া। উন্মত্ত একদল অপরাধী সেই শহরে মৃত্যুর বীজ বুনে দিলো। —এই ট্র্যাজেডি, এই মানব-হত্যার কোনো ক্ষমা নেই।

কার হয়ে এই আক্রমণ? কার নামে এই আক্রমণ? এই অবর্ণনীয় নৃশংসতা, এই অন্ধ ঘৃণা কি কোনো 'লক্ষ্য'-কেই বৈধতা দিতে পারে? মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবেই এই ১৩ নভেম্বর, শুক্রবার চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সাত বছর আগের ২৬/১১-র মুম্বই হামলার মত প্রায় একই ছকে, একই ধাঁচে একই সময়ে শহরের নানা প্রান্তে একযোগে হামলা, হত্যালীলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। কনসার্ট হল, জাতীয় স্টেডিয়ামসহ প্যারিসের ছয় জায়গায় নিখুঁত সমন্বয়ে পর পর আক্রমণ। যার বলি অন্তত ১২৮ জন, জখম ২৫৭। এদের মধ্যে ৮০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক — এ তথ্য লে মঁদে পত্রিকার ঐ দিনেরই শেষ রাতের অনলাইন সংস্করণের।

অল্প সময়ের ব্যবধানে সন্ত্রাসবাদীদের নিশানা প্রথমে বেইরুট, পরে বাগদাদ, শেষে প্যারিস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন ভয়াবহ হামলার মুখোমুখি আর কখনও হয়নি ফ্রান্স। আত্মঘাতী ফরাসি সন্ত্রাসবাদী ইরাক, সিরিয়ার মত বিদেশে হামলা চালালেও, এই প্রথম নিজের ভূখণ্ডে আত্মঘাতী হামলার শিকার ফ্রান্স।

শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত ৯.১৫ মিনিট নাগাদ প্রথম বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে স্তাদে দে ফ্রান্স স্টেডিয়াম, যেখানে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। গ্যালারিতে দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ফ্রাসোয়াঁ ওলান্দে ও জার্মানির বিদেশমন্ত্রী। পরপর তিনটি বিকট শব্দ, মুহূর্তে গোটা স্টেডিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। যদিও বিস্ফোরণ ঘটে স্টেডিয়ামের বাইরে অবস্থিত ম্যাকডোনাল্ডসের বিপনীর সামনে ও জুলে রিমেতে। এতে ৪ জনের মৃত্যু হয়।

রাত সাড়ে ৯টায় কাম্বোডিয় রেস্তোরা লে পেতিত ক্যামাজে নৈশ ভোজের আসরে সন্ত্রাসবাদীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে ১২ জন নিহত হন। আধঘন্টার মধ্যে মার্কিনব্যান্ড ঈগলস অব ডেথ মেটালের সুরে মুর্ছিত ১৫০০ মানুষে ঠাসা শহরের বাটক্লা কনসার্ট হল মুহূর্তের মধ্যে সুরের বদলে 'রক্তের বন্যা'য় পর্যবসিত হয়। কালো মুখোশের আড়ালে একে-৪৭ হাতে

চারজন সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালায়। নিহত হন ৮২ জন। একজন সন্ত্রাসবাদী পুলিশের গুলিতে নিহত হন, বাকী তিনজন ছিলেন আত্মঘাতী পোশাকে।

কনসার্ট হলে হামলার অল্প পরে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালায় লাবেলে ইকুইপ বারে, বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে। একইভাবে হামলা চালানো হয় শহরের কেন্দ্রস্থল শ্যারোনে এশীয় রেস্তোরাঁয়, অ্যাভিনিউ দেলা রিপাবলিক, লু কার লিন বারে।

প্যারিস ফিরিয়ে এনেছে মুম্বাইয়ের স্মৃতি। প্রায় মুম্বাইয়ের ধাঁচেই হামলা চালায় অন্তত আটজন আত্মঘাতী বিস্ফোরণকারী। এদের মধ্যে সাতজন নিজেরাই নিজেদের উড়িয়ে দেয়। একজনের মৃত্যু হয় নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে। মুম্বাইতে সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা ছিল ১০। হামলা চালিয়ে ছিল পাঁচ জায়গায়। নিহতের সংখ্যা ছিল ১৬৬, জখম ২৯১। উন্নত প্রযুক্তির পরিবর্তে দুটি ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় সস্তার প্রযুক্তি। নিজেদের মধ্যে সমন্বয় ছিল নিখুঁত। ঠান্ডা মাথায় একে-৪৭, গ্রেনেড ব্যবহার করে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা। কৌশলগত এসব মিলের থেকেও বড় কথা নিরীহ মানুষের প্রাণহানি। মুম্বাইয়ের মতই গত শুক্রবার রাতে রক্তে ভিজেছে উজ্জ্বল প্যারিস শহরের মাটি।

সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'আইসিস' (ইসলামিক স্টেট ফর ইরাক এন্ড সিরিয়া) জানিয়ে দিয়েছে প্যারিস আক্রমণ তারাই ঘটিয়েছে। আত্মঘাতী বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তারা তাদের যোদ্ধাদের পাঠিয়েছে ফ্রান্সে। সিরিয়ায় বিমান হানা বজায় থাকলে ফ্রান্স তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবেই থাকবে। আইসিস লাগাতার সন্ত্রাসবাদী হামলা চালাচ্ছে। ১২ নভেম্বর লেবাননের বেইরুটে বা পাকিস্তানে কার্পেট বম্বিং করে সন্ত্রাসবাদের কোনও সমাধান হতো না। মৃত্যু হতো কিছু নির্দোষ মানুষের। এব্যাপারে সকলেই একমত যে, আইসিস বা আলকায়দাকে দমন করার কোন সহজ উত্তর নেই। কিন্তু সৌদি আরব, কাতার বা তুরস্ককে পশ্চিমী দেশগুলির সাহায্য আর সিরিয়ায় বিমান হানাও এর সমাধান সূত্র হতে পারে না। আমরা সকলেই মনে করি, সন্ত্রাসবাদের কোন সীমানা নেই। যে কোন মূহূর্তে যে কোন দেশেই নিরীহ মানুষ বিনা অপরাধে প্রাণ হারাতে পারে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে। তাই রাষ্ট্রশক্তিগুলির কাছে মানবিক আবেদন : নিরীহ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। আর সোস্যাল মিডিয়ায় শুধু পিস ফর প্যারিস শ্লোগান নয়, শ্লোগান হোক পিস ফর ইরাক, পিস ফর প্যালেস্টাইন, পিস ফর সিরিয়া— পিস ফর দি ওয়ার্ল্ড। □

দেবাশীষ রায়

শুরু হলো বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন

বিগত ৩০ নভেম্বর প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন শুরু হয়েছে। যোগ দিয়েছেন ভারতসহ প্রায় দেড়শোটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা। এই সম্মেলন চলবে বারো দিন। বিশ্বায়িত উষ্ণায়নের জন্য দায়ি গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর লক্ষ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি তৈরি করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। উপস্থিত হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিঙ থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা।

প্যারিসে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর দু-সপ্তাহ অতিক্রম করার আগেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শীর্ষ বৈঠকস্থল ঘিরে রয়েছে ২,৮০০ পুলিশের নিরাপত্তাবলয়। গোটা শহরে মোতায়েন করা হয়েছে ৬ হাজারের বেশি পুলিশ।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নত দেশগুলির একপেশে মনোভাবের প্রতিবাদ জানিয়ে প্যারিসে নিষেধাজ্ঞা ভেঙে এদিন মিছিল সংগঠিত হয়। গ্রেপ্তার বরণ করেন ১০৮ জন।

প্যারিসে ভারতীয় প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করে মোদী বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তন গোটা বিশ্বের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এটা আমাদের তৈরি নয়।" তিনি আরও বলেন যে এর দ্বারা দেশের কৃষকরা বিপদগ্রস্ত। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ভারত জ্বালানি হিসাবে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর উপর জোড় দিচ্ছে। □

তাজমহলও নাকি হিন্দু মন্দির এবং সেখানে হিন্দুদের উপাসনার ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। এমনই অত্যাশ্চর্য দাবি করে আগ্রার একটি আদালতে মামলা দায়ের করেছেন জনৈক ব্যক্তি। তবে অন্তত এক্ষেত্রে স্বস্তির কথা হলো কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবিকে সমর্থন করেনি। লোকসভায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী মহেশ শর্মা জানিয়েছেন, যে আগ্রার তাজমহল কোন এক সময়ে হিন্দু মন্দির ছিল এমন প্রমাণ কেন্দ্রীয় সরকার পায়নি। তিনি আরও বলেছেন, এই বিতর্কে তাজমহলের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। □

মহার্ঘভাতা না দেওয়ার কারণ কি আর্থিক সংকট?

বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সদস্য প্রায়শই বলে থাকেন যে, আর্থিক সংকটই এর কারণ। সংবাদমাধ্যমে এমন কথাও প্রকাশিত হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন—কর্মচারীদের অনেক কিছুই দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আগের সরকার (বামফ্রন্ট) এত বেশি ঋণ করে গেছে যে ঋণের কিস্তি ও সুদ দিতেই রাজ্যের সব আয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে আরও বলেছেন, ঋণের কিস্তি, সুদ এবং কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন দিতেই মোট আয়ের ৯৪ শতাংশ খরচ হয়ে যাচ্ছে। ফলে রাজ্যের উন্নয়নের কাজে টাকা থাকছে না। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য হিসেবে যা প্রকাশিত হয়েছে, তার সাথে তাঁরই সরকারের পেশ করা তথ্যের কোনো মিল রয়েছে কি না তা একবার দেখা যেতে পারে।

২০১৫-১৬ সালের বাজেট পেশ করতে গিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যে গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি বিধানসভায় পেশ করেছেন তার নাম 'বাজেট এ্যাট এ গ্ল্যান্স'। ঐ দলিলে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী ২০১৪-১৫ সালে রাজ্য সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা। অন্য দিকে ঋণের কিস্তি ও সুদ এবং বেতন ও পেনশনবাবদ ব্যয়ের মোট পরিমাণ ছিল ৭৪ হাজার ৮৮৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আয়ের ৫৮ শতাংশ এই তিনটি খাতে ব্যয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন (৯৪ শতাংশ খরচ হয়ে যায়) তার সাথে তাঁরই সরকারের পেশ করা বাজেটের কোনো মিল নেই।

উপরের তথ্য থেকেই দেখা যায়, যে ঋণ শোধ এবং বেতন ও পেনশন দেওয়ার পরেও রাজ্য সরকারের হাতে থাকে ৫৪ হাজার কোটি টাকা। যা দিয়ে উন্নয়নের কাজ করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে (২০১০-১১) বেতন, পেনশন ও ঋণ শোধ খাতে মোট আয়ের ৬৮ শতাংশ ব্যয় হয়েছিল। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের তুলনায় যার পরিমাণ ছিল বেশি। এতদসত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার কখনোই কর্মচারীদের বেতন-পেনশনকে উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দায়ি করেনি। অর্থাৎ পার্থক্যটা আর্থিক অবস্থার কারণে নয়, পার্থক্যটা উভয় সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর।

কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা সময়ে না দিতে পারার জন্য বিগত সরকারকে দায়ি করা বর্তমান সরকারের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অথচ তথ্য বলছে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার বিগত সরকারকে অনেকখানি পেছনে ফেলে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছরে মোট ঋণ করেছিল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। যার মধ্যে ৭৯ হাজার কোটি টাকা ছিল স্বল্প সঞ্চয় খাতে ঋণ। যা ছিল বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকারের বাৎসরিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ৪৪৯ কোটি টাকা। অথচ বর্তমান সরকার পাঁচ বছরেরও কম সময়ে ঋণ করেছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে বড় অংশই হলো বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণ। কারণ এই সরকারের আমলে চিটফান্ডের বাড়বাড়ন্তের জন্য স্বল্প সঞ্চয় খাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমেছে। ফলে এই সরকারের বাৎসরিক ঋণের পরিমাণ ২১ হাজার কোটি টাকা। যে কাজের জন্য তারা পূর্বতন সরকারকে দায়ি করে, সেই কাজে তারা নিজেরাই কয়েক কদম এগিয়ে। □

৯৮তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে মস্কোর রাস্তায় মানুষের ঢল

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ **www.statecoord.org**
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।